মাহে রমাযান : তাকওয়া ও তাওবার মাস

শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রমাযান উপলক্ষে প্রদত্ত কয়েকটি বয়ানের নির্বাচিত অংশ

হামদ ও সালাতের পর...

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(অর্থ:) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছিল। যেন (রোযার সাধনা দ্বারা ধীরে ধীরে) তোমরা মুত্তাকী ও খোদাভীরু হয়ে যাও। (সূরা বাকারা-১৮৩)

রোযা ফারসী শব্দ। এর আরবী হল সাওম, বহুবচনে সিয়াম। সাওমের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা। শরীয়তের পরিভাষায়– রোযা রাখার নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা এবং সহবাস করা থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়।

দয়াময়ের মায়াময় আহ্বান

রোযার বিধান নাযিল করার শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে 'হে ঈমানদারগণ!' বলে সম্বোধন করেছেন। অতঃপর জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে। এ সম্বোধনের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম উপায়ে মুমিন বান্দাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত বিধান অম্লান বদনে মেনে নেয়া উচিত, তা সে বিধান যত কঠিনই মনে হোক না কেন– এটা তার অন্তরে লালিত ঈমানের আবেগ ও দাবী। বস্তুত আল্লাহর পক্ষ হতে এ হৃদয়জুড়ানো মায়াময় আহ্বানই বান্দাদেরকে রোযার বিধান পালনে পাগলপারা করে তোলে। তখন সে অভুক্ত থাকার মধ্যেই এমন স্বাদ ও তৃপ্তি পায়, যা বড় বড় রাজা-বাদশাহগণ রকমারী খানাপিনা এবং বিলাসবহুল প্রাসাদের মধ্যেও কল্পনা করতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা রোযার বিধান দেয়ার ক্ষেত্রে এদিকেও খেয়াল রেখেছেন যে, মুমিন বান্দারা যেন এ বিধানকে কোনওভাবে অসাধ্য কিংবা দুঃসাধ্য মনে না করে, বরং খুশি খুশি স্বাগত জানায়। এ জন্য রোযার হুকুম দিয়ে সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, এই বিধান শুধু তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি; পূর্ববর্তী সকল উম্মতের প্রতিও ফরয করা হয়েছিল। ফলে উম্মতে মুহাম্মদী যখন জানতে পারল যে, রোযার বিধান কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়; পূর্ব থেকেই এটা চলে এসেছে, তখন তাদের জন্য এই বিধান পালন করা সহজ মনে হবে। কারণ মানুষের স্বভাব হল, যে কাজ সকলেই করতে পারে বলে সে জানে, ঐ কাজকে সে সহজ মনে করে।

শুধু তা-ই নয়, বান্দা যেন রোযা রাখার কষ্ট বরদাশত করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায় এজন্য আল্লাহ তা'আলা রোযার বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণনা করেছেন এবং এটা যে অল্প কয়েকদিনের ব্যাপার সেকথাও আলাদা করে জানিয়ে দিয়েছেন– 'রোযা তো হাতেগোনা কয়েকটি দিনের জন্য।' অর্থাৎ বৃহত্তর স্বার্থে মাত্র কয়েকটা দিবস না খেয়ে থাকলে এমন কি আসে যায়? তাছাড়া রাতের বেলা তো তোমাদের খানা-পিনার অনুমতি আছেই!

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পাক তার বান্দাদের অবস্থার প্রতি কত সুগভীর নজর রাখেন। বান্দারা কমতি করলেও বান্দার প্রতি তার মায়া-মমতা সীমাহীন। তিনি একটা আদেশ দিচ্ছেন তো কতো মহব্বতের সুরে ডাক দিয়ে, কত নরম ও মোলায়েম করে দিচ্ছেন। তিনি তো আহকামুল হাকিমীন, রাজাধিরাজ। তিনি ইচ্ছা করলে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো প্রজাদের মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই জোর-যবরদস্তিমূলক শুধু হুকুমটা শুনিয়ে দিতে পারতেন, চাই এতে বান্দাদের শরীর ও মনের উপর দিয়ে যা কিছুই বয়ে যাক। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি চেয়েছেন বান্দারা চিন্তা-ভাবনা করে, আমলের লাভ-ক্ষতি উপলব্ধি করে স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার হুকুম মানুক, তার আনুগত্য করুক। এমন দয়ালু আল্লাহর আদেশ উপেক্ষা করা, শরীর-স্বাস্থ্য সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখা, বান্দার কত বড় নেমকহারামী!

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তো রোযা ভাঙ্গার অনুমতি সত্ত্বেও জিহাদের কষ্টকর সফরেও রোযা ছাড়তেন না। অথচ সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কত কিশোর, কত যুবক এবং কত বয়স্ক লোকও রমাযান মাসে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে পানাহার করে! এসব দুঃসাহসিক নাফরমানী আল্লাহর আযাব-গযবের দুয়ার খুলে দেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

রোযার বিধান ধনী-গরীব সবার জন্য

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেছেন, যেহেতু মানুষকে তার জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি থেকে বিরত রাখা সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, এজন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শুরু যামানায় রোযার বিধান নাযিল করেননি। এমনকি হিজরতের পরও সাথে সাথেই রোযার নির্দেশ দেননি। বরং হিজরতের পর মদীনার খোলামেলা পরিবেশে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পরও মুসলমানদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিয়েছেন। অতঃপর যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের শেকড় অত্যন্ত মজবুতভাবে বসে গেছে, তাওহীদের দাবী এবং নামাযের মর্মবাণী তাদের রগ-রেশায় মিশে গেছে, আল্লাহ তা'আলার যে কোন হুকুম পালন করার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত, তখন গিয়ে হিজরতের দ্বিতীয় বছর রোযা ফরয করা হল।

এখানে লক্ষণীয় যে, রোযার বিধান ঠিক এমন সময় নাযিল হল, যখন সমগ্র বিশ্বে কুফর, শিরক ও তাগুতী শক্তির মুকাবেলায় জিহাদের মাধ্যমে সহায়-সম্বলহীন মুসলমানদের উপর থেকে বিপদের মেঘ কিছুটা কেটে যায় এবং আনসারদের সহযোগিতায় মুসলমানদের অভাব-অনটন ও চরম দারিদ্র্য কিছুটা লাঘব হয়। এর রহস্য সম্ভবত এই যে, দুর্যোগ-মুহূর্তে রোযার বিধান নাযিল হলে কেউ ভাবতে পারতো, রোযা হচ্ছে আর্থিক দৈন্যদশা ও অসচ্ছলতার শিকার ফকীর-মিসকীন এবং অসহায়-মযলুম লোকের ইবাদত, বিত্তশালী এবং বাগ-বাগিচার মালিক সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের জন্য

ইবাদত নয়। মুসলমানদের কিছুটা সচ্ছলতার যামানায় রোযার বিধান নাযিল হওয়ায় এ অমূলক ধারণার অবকাশ থাকেনি। সুতরাং ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাইকেই রোযার ফরয বিধান পালন করতে হবে।

রোযার সবচেয়ে বড় উপকারিতা তাকওয়া

আয়াতের শেষাংশের সারমর্ম হচ্ছে, রমাযানের এক মাস খানা-পিনা ও খাহেশাতের কুরবানী উদ্দেশ্যহীন নয়। এর একটা মহান মাকসাদ ও উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল, এই দীর্ঘ মেহনত-মুজাহাদা এবং ত্যাগ-সাধনার মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া তথা খোদভীতি অর্জন করা। আর তাকওয়া ও খোদাভীতি এমনই এক মহাদৌলত যে, একমাত্র এরই ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে বান্দার সম্মান ও মূল্যমান নির্ণিত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্মানী, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে। (সূরা হুজুরাত-১৩) অর্থাৎ যার অন্তরে তাকওয়া বেশি সে-ই বেশি সম্মানী।

রোযা তাকওয়া অর্জনের কার্যকর ও পরীক্ষিত প্রশিক্ষণ

যখন কোন বান্দা রোযা রাখে, রোযা রাখার পর কখনও তার অবস্থা এই হয় যে– প্রচণ্ড গরমের দিন, পিপাসাও লেগেছে, ঘরের ভেতর সে সম্পূর্ণ একা, দরজাও বন্ধ, ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি আছে, শরবতও মজুদ আছে এবং পান করার তার প্রচণ্ড রকম ইচ্ছাও জেগেছে– তথাপি ঐ ব্যক্তি যত বড় পাপীই হোক, পানি পান করে না, শরবতের গ্লাসে মুখ লাগায় না; অথচ পান করলে কোন মানুষ তো দূরের কথা, কাকপক্ষীও টের পেতো না। এর একমাত্র কারণ এ-ই যে, সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, কেউ না দেখুক তার প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি তাকে রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন তিনি তাকে ঠিকই দেখছেন। সুতরাং তাকে ফাঁকি দিয়ে পানি পান করার, রোযা নষ্ট করার কোন উপায় নেই।

মুহতারাম হাযেরীন! এই যে আল্লাহর মহব্বতে তার হুকুম পালন করা, আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং আল্লাহর ভয়ে তার হুকুম লঙ্ঘন না করা, অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া– এটাই তাকওয়া ও খোদাভীতির সারমর্ম।

আল্লাহ তা'আলার যে সকল বান্দা হুট করেই নেককার হওয়ার সাহস করতে পারে না, একমুহূর্তেই গুনাহ ছাড়ার হিম্মত করতে পারে না– রমাযান মাস এবং এ মাসের রোযা তাদের জন্য সহনীয়মাত্রার, অত্যন্ত কার্যকর ও অব্যর্থ এক প্রেসক্রিপশন।

রোযাদার দিনের বেলায় দীর্ঘ একটা সময় না খেয়ে থাকে। এতে শরীর কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। শারীরিক দুর্বলতার কারণে যৌনকামনাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে কুপ্রবৃত্তি, যা রোযাদারকে গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সেটাও দুর্বল হয়ে যায়। ফলে রোযাদারের মনে গুনাহের প্রতি ততোটা আকর্ষণ থাকে না। পাশাপাশি ইবাদতের মৌসুম হওয়ায়, আল্লাহর রহমত অবারিতভাবে বর্ষিত হওয়ায়, দুরাচার শয়তান শিকলে আবদ্ধ থাকায় রোযাদার নামায-কালাম, যিকির-আযকারের প্রতিও সবিশেষ মনোযোগী হয়।

মুহতারাম হাযেরীন! এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকভাবে রমাযানের একেকটি রোযা রাখতে থাকে, ফরয-সুন্নাত ও তারাবীহ নামাযের পাবন্দি করতে থাকে এবং একটা মাস একটু কষ্ট করে হাত-পা-চোখ-মুখ-কান ও অন্তরের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বাড়তে থাকে, আল্লাহর প্রতি ডর-ভয় জমতে থাকে এবং গুনাহের আগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করার এক বিস্ময়কর শক্তি তার মধ্যে পয়দা হয়। ফলে রমাযানের পর তার পক্ষে আর আল্লাহর নাফরমানী করা অতটা সহজ হয় না, যতটা রমাযানের আগে সহজ ছিল। এটাই কাঙ্ক্ষিত তাকওয়া এবং এটাই রমাযানের সবচেয়ে বড় উপকারিতা।

শুরু থেকেই সচেতন হোন

সুখের দিনগুলো খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়। ইবাদতের মৌসুম রমাযানও খুব দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যায়। দেখতে না দেখতে, চিন্তা-ফিকির করতে না করতে হঠাৎই চলে যায়। এটা ইবাদতের মাস। কুরআনের মাস। লাইলাতুল কদর তালাশ করার মাস। লাইলাতুল কদর তালাশ করার জন্য ইতিকাফের মাস। তো এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি কতটুকু তাওফীক পেলাম এটা হল ভাবার বিষয়। এই সুবর্ণ সুযোগ আমি কতটুকু কাজে লাগালাম এটা হল দেখার বিষয়। সুতরাং রমাযানের শুরু থেকেই আমাদেরকে এ ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করে চলতে হবে। তা না হলে বড় আফসোস। কারণ এই মাস যদি চলে যায়, আর আমার-আপনার মাগফেরাত না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে নবীজীর বদদু'আর শিকার হয়ে যাবো। হাদীসে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি সবচেয়ে দয়ার্দ্র হওয়া সত্ত্বেও তিনবার ধ্বংসের জন্য বদদু'আ করেছেন যে, আমার ঐ উম্মত ধ্বংস হয়ে যাক...। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কার জন্য এই কঠিন বদদু'আ করলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বললেন, আমার ঐ উম্মত دخل عليه رمضان যে রমাযান পেয়েছিল, ثم انسلخ অতঃপর ঐ রমাযান তার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল, ولم يغفر له কিন্তু তাকে মাফ করা হয়নি। হয়নি মানে সে মাফই চায়নি। বান্দা চাইবে, আর আল্লাহ মাফ করবেন না, এমন কোন বিধান তো নেই। তিনি তাঁর হাবীবকে দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন– إن العبد إذا اعترف، ثم تاب، تاب الله عليه অর্থাৎ বান্দার যদি কোন গুনাহ হয়ে যায়, আর সে এটা স্বীকার করে যে, আল্লাহ! আমি আপনার নাফরমানী করে ফেলেছি, আপনি আমাকে লাখো নেয়ামতে ডুবিয়ে রেখেছেন, তবুও আমি শয়তানের গোলামী করে ফেলেছি, আপনার নাফরমানী করে ফেলেছি, আমার আর কোন রব্ব নেই, অতএব আপনি ছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে মাফ করে দিন। তো বান্দা যখন এ রকম স্বীকারোক্তি দিবে, এই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ঐ গোনাহগার বান্দাকে মাফ করে দিবেন। তিনি মাফ করাকে পছন্দ করেন। তিনি তাওবাকারীকে পছন্দ করেন। তাওবাকারীকে শুধু মাফই করেন না, ভালোও বাসেন, মুহাব্বতও করেন।

এর উদাহরণ হল, কোন এক মায়ের একটা সন্তান হারিয়ে গিয়েছিল। বহু খোঁজাখুঁজির পর, ছয় মাস/নয় মাস পর তাকে পাওয়া গেল। এখন মা তার ফিরে পাওয়া সন্তানসহ সবাইকে নিয়ে খেতে বসেছে। সন্তান তো তার আরো আছে। তা সত্ত্বেও বলুন না, মা খানার সময় কোন্ সন্তানের প্রতি বেশি খেয়াল করবে? কার পাতে মাছের মাথাটা তুলে দিবে? যারা এতদিন সামনে ছিল তাদেরকে, নাকি যাকে নতুন করে ফিরে পাওয়া গেল তাকে? গুনাহগার বান্দাও ঐ রকম হারিয়ে যায়। আবার যখন আল্লাহর দরবারে ধরা দেয়, তো কুরআনের আয়াতে আছে– إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. আল্লাহ তাওবাকারীকে মুহাব্বত করেন। শুধু মাফই করেন না, মুহাব্বতও করেন।

রমাযান ও লাইলাতুল কদর এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য

রমাযান মাস আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। আগের উম্মত রোযা পেয়েছে, কিন্তু রমাযান পায়নি। তাদের রোযা ছিল অন্য মাসে। আগের কোন উম্মত লাইলাতুল কদর পায়নি। এটা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। আগের উম্মত দীর্ঘ-সুদীর্ঘ হায়াত পেয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম তো তার কওমকে দাওয়াতই দিলেন সাড়ে নয়শ বছর। তাহলে তার হায়াত কত ছিল? পক্ষান্তরে আমাদের হায়াত ৬০ থেকে ৭০ বছর। হাদীসে এসেছে, এই উম্মতের গড়পড়তা হায়াত ৬০ থেকে ৭০ বছর। নবীজীর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই অল্প হায়াতে আমরা নেকীর দিক দিয়ে আগের উম্মতের সমপর্যায়ে কিভাবে পৌঁছব? নবীজী উত্তর দিলেন, হতাশ হয়ো না, আল্লাহ তা'আলা আমার উসীলায় তোমাদেরকে কিছু ইবাদত দান করেছেন, সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা ইবাদতের লাইনে আগের উম্মতের বরাবর বরং অগ্রগামী হয়ে যাবে। যেমন এই যে আমরা জুমু'আর নামাযের জন্য আসি এবং নামায শেষে ফিরে যাই; জুমু'আর দিন কেউ যদি ছয়টি কাজ করে তাহলে তার যাওয়া-আসার প্রত্যেক কদমে এক বছর নামায এবং এক বছর রোযার সওয়াব দেয়া হয়। সুবহানাল্লাহ! প্রতি পদক্ষেপে দুই বছরের ইবাদতের সওয়াব! এটা আগেকার কোন উম্মত পায়নি।

অনুরূপভাবে এই যে রমাযান মাস। এ মাসে নফল ইবাদতগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ফরযের স্তরে উন্নীত করেছেন। নফলকে ফরযের মর্যাদা দান করেছেন। আর ফরযের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন ৭০ গুণ। কাউকে এক গ্লাস পানি দিয়ে ইফতার করাচ্ছেন, তো ওই ব্যক্তির রোযার সমান সওয়াব আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও প্রদান করবেন। এই মাস যেন নেকীর এক পাইকারী মার্কেট; পাইকারী বাজার। আপনার অধীনস্ত কর্মচারীর, কাজের লোকের কাজের ভার কিছুটা হালকা করে দিলেন, বেতনটা বাড়িয়ে দিলেন, এর বিনিময়ে আপনাকে এমন শরবত পান করানো হবে, জান্নাতে যাওয়ার আগে আপনার আর পান করার প্রয়োজন পড়বে না। নেকী অর্জনের এই যে মহোৎসব, এর মধ্যে আবার দান করেছেন লাইলাতুল কদর। এই এক রাতে আপনি ঘুমের চাপ প্রবল হওয়া পর্যন্ত ইবাদত করবেন, পুরো রাতের কথা বলছি না, শুধু ঘুম প্রবল হওয়া পর্যন্তই ইবাদত করবেন, আপনাকে হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও বেশি সওয়াব প্রদান করা হবে। লক্ষ্য করুন, বলা হল, বেশি দিবেন। তো এই 'বেশি' কথাটা কে বলেছেন? রব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন। বেশি দিবো, বেশি দিবো অনেকেই বলে। কিন্তু সবার বেশি একপাল্লার নয়, এক ওজনের নয়। যেমন কোন লাখপতি বলল, তোমার মেয়ের বিয়ে তো, আচ্ছা বাসায় এসো, বড় রকমের একটা সাহায্য করব। একই কথা কোন কোটিপতিও বলল যে, কালকে অফিসে এসো, তোমার মেয়ের বিয়েতে বড় রকমের একটা সাহায্য করব। আবার একই কথা কোন বিলিয়নারও বলল। দেখা যাচ্ছে, সবাই 'বড়'-র আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু সবার 'বড়' এক মাপের নয়। লাখপতি হয়তো এক হাজার টাকা দিবে। কোটিপতি ১০ হাজার দিবে। আর বিলিয়নার হয়তো এক লাখ দিবে। কিন্তু এই কথা যদি রব্বুল আলামীন বলেন, তাহলে এর আনুপাতিক মাপ কী হবে?

যাই হোক, আল্লাহ তা'আলা বেশি দিবেন বলেছেন, কিন্তু একথা তো বলেননি যে, সেই বেশিটা হল এক হাজার মাসের সমান। এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমে 'সমান/বরাবর' অর্থ প্রদায়ক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। কুরআনে বলা হয়েছে ليلة القدر خير 'খাইর' মানে অতি উত্তম। এখন ভাবুন, আল্লাহর বলা 'অতি উত্তম' যে কতগুলো 'এক হাজার মাস' থেকে বেশি উত্তম হবে এর ক্যালকুলেশন করতে, হিসাব নিকাশ করতে এমনকি এ ব্যাপারে ধারণা করতেও আমাদের মস্তিষ্ক অক্ষম। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।

ইতিকাফকারীর লাইলাতুল কদর হাতছাড়া হয় না

আর এই লাইলাতুল কদর পাওয়ার জন্য রাখা হয়েছে ইতিকাফ। অর্থাৎ রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতে হবে। এটা সুন্নাতে মুআক্কাদা। কিছু লোককে ইতিকাফ করতেই হবে। অন্যথায় সবাই গুনাহগার হবে। যারা ইতিকাফ করে তাদের লাইলাতুল কদর হাতছাড়া হয় না। ইতিকাফকারী ঘুমিয়ে থাকলেও লাইলাতুল কদর তার হাতছাড়া হয় না।

আর যারা বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে টানা ১০ দিন ইতিকাফ করতে পারেন না, সুযোগ পান না– তাদের করণীয় হল, তারা দিনে না পারলেও ১০টি রাত যেন মসজিদে ইতিকাফে কাটান। দিনে দিনে সব কাজ সেরে ইশার নামায পড়তে চলে আসেন। এসে ফজর পর্যন্ত মসজিদে নফল ইতিকাফ করেন। তাহলে তারও লাইলাতুল কদর ছুটবে না।

এটাও যদি কেউ না পারে, তাকেও আল্লাহ তা'আলা মাহরূম করেননি। তার কর্তব্য হল, তার যেন শেষ দশকের ইশা আর ফজরের জামাআত না ছোটে। ইশার নামায জামাআতের সাথে পড়লে আধা রাত ইবাদত করার সওয়াব হয়। আর ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়লে বাকি আধা মিলে পুরো রাত ইবাদতের সওয়াব হয়।

লাইলাতুল কদর লাভ করার এই যে তিনটি স্তর, আমাদের প্রত্যেককে এর কোন না কোন একটাতে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। হাদীসে এসেছে, পোড়াকপাল ছাড়া কেউ লাইলাতুল কদর থেকে বঞ্চিত হয় না। সুতরাং যে কোন মূল্যে এটা আমাদেরকে পেতেই হবে।

কুরআনের ছোঁয়ায় লাইলাতুল কদরের এত কদর।

এখন কথা হল, লাইলাতুল কদরের এত ফযীলত কেন? কারণ, আল্লাহ তা'আলা এই রাতে লওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানে কুরআনে কারীমের একটা কপি নাযিল করেছিলেন। সাত আসমানেরও উপরে হল আরশ। এই আরশেই আছে লওহে মাহফূয। আল্লাহ তা'আলা লাইলাতুল কদরে লওহে মাহফূয থেকে কুরআন নাযিল করেছেন। এই রাতটি ঐ কুরআনের ছোঁয়া পেয়েছিল। তাই এই রাতের এত ফযীলত। এখন বলুন, যে কুরআনের সংস্পর্শে লাইলাতুল কদরের এত ফযীলত, সেই কুরআন যদি আপনার-আমার সীনায় থাকে তাহলে আপনার-আমার মর্যাদা কেমন হবে? জ্বী, কুরআন যদি যথাযথভাবে, সহীহ-শুদ্ধভাবে আপনার-আমার সীনায় থাকে, আমাদের ছেলে-মেয়ে, পরিবার-পরিজনের সীনায় থাকে তাহলে এরা তো জান্নাতী মানুষ। এদেরকে দোযখে ফেলা হলেও দোযখের আগুন এদেরকে স্পর্শ করবে না।

মুহতারাম, এই কুরআন সীনায় থাকতে হবে। এই কুরআনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মেহনত-মুজাহাদা করতে হবে, মাদরাসা কায়েম করতে হবে। কী করতে হবে? মাদরাসা কায়েম করতে হবে। মাদরাসা কায়েম করে শিক্ষকের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, ছাত্রদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ হাশরের ময়দানে নবীজীর পক্ষ হতে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি আমার মাথা ভেঙে, দাঁত ভেঙে, আমার শরীর রক্তাক্ত করে

কুরআনের আমানত তোমাদের কাছে রেখে এসেছিলাম। সেই কুরআন তুমি চৌদ্দশ বছরের মাথায় পেয়েছিলে। তোমার পরের লোকজন কিভাবে এই কুরআন লাভ করবে তার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। সেই মাদরাসার জন্য হে আমার উম্মতী! তোমার কী অবদান ছিল? যারা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে, আল্লাহর হাবীব তাদের জন্য খুশি খুশি শাফা'আত করবেন। আর যারা জবাব দিতে পারবে না, তাদের ব্যাপারে সূরা ফুরকানের ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবেন–

وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

–রব্বুল আলামীন! আমার উম্মতের এই লোকগুলো, কুরআনের ব্যপারে এদের কোন কুরবানী নেই, কোন ত্যাগ নেই, কোন ভূমিকা নেই, কোন চেষ্টা নেই, এরা এই কুরআনকে একেবারেই পরিত্যাগ করেছিল।

জ্বী, আল্লাহর হাবীব স্বয়ং ফরিয়াদ করবেন। আর আল্লাহর হাবীব যদি কারো বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেন, খোদ শাফা'আতকারীই যদি অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে আর কোন্ শাফা'আতকারী তার জন্য শাফা'আত করবে? এজন্য প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হল, দীনী মাদরাসার দাতা হওয়া, দান-খয়রাত করা।

দীনী মাদরাসায় যে সকল তালিবে ইলম থাকেন, হাদীসে তাদেরকে রাসূলের মেহমান বলা হয়েছে। হাজীদেরকে বলা হয় আল্লাহর মেহমান। আর তালিবে ইলমদেরকে বলা হয় রাসূলের মেহমান। নিজের মেহমানকে আমরা কত সম্মান করি, কতভাবে আপ্যায়ন করি। আজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে নেই। কিন্তু তার মেহমানগণ সারা দুনিয়াতে আছেন। এই মেহমানদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসায় কোন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মুহতারাম হাযেরীন! এতক্ষণের আলোচনায় আমরা নিশ্চয়ই লাইলাতুল কদরের হাকীকত বুঝতে পেরেছি যে, লাইলাতুল কদর কীভাবে মর্যাদাময় হয়েছে। কুরআনের ছোঁয়ায়, কুরআনের বরকতে হয়েছে। সেই কুরআন যদি আমি তিলাওয়াত না করি, ছেলে-মেয়েদেরকে না শেখাই, কুরআনী মাদরাসা কায়েম না করি, কুরআনসংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন না করি, বরং শুধু ইতিকাফ করে নেয়াকেই যথেষ্ট মনে করি, তাহলে এটা তো বাদামের খোসা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মত হল, যার মধ্যে কোন শাঁস নেই? কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক না গড়ে শুধু ইতিকাফ করলাম, তো বাদামের খোসা হাসিল হল। পক্ষান্তরে কুরআন সহীহ করলাম, মাদরাসায় দান-খয়রাত করলাম এবং ইতিকাফও করলাম, তো এর মাধ্যমে আস্ত বাদাম হাসিল হল, যার শাঁসও আছে, খোসাও আছে।

এ কথাটা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। লাইলাতুল কদরের শুধু বাহ্যিক দিকটি নিয়ে থাকলেই চলবে না, এর অন্তর্নিহিত দাবিটিও উপলব্ধি করতে হবে। লাইলাতুল কদরের অন্তর্নিহিত দাবী হল, কুরআনকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা, তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। সুতরাং মাদরাসার বিপক্ষে কাফেররা যত শ্লোগানই দিক, মাদরাসায় দান-খয়রাতের ব্যাপারে যে যা-ই বলুক, আমরা সবাই সব সময় কুরআনের পক্ষে থাকব। আমাদের যাকাত থেকে, ফেতরা থেকে মাদরাসাগুলোর লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে সাধ্য অনুযায়ী দান-খয়রাত জারী রাখবো ইনশাআল্লাহ।

লাইলাতুল কদরের আমল

মুহতারাম হাযেরীন! আমরা লাইলাতুল কদরের তালাশে রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করব, বেজোড় রাত্রিগুলোতে নফল আমল বাড়িয়ে দিব। বেশি বেশি তাওবা করব, ইস্তিগফার ও দু'আ করব। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তাহলে কী দু'আ করব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তুমি বলবে– اللهم إنك عفو فاعف عني হে আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল, তাই দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। কত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী দু'আ! এই দু'আটা আমরা মুখস্থ করে নিব। একজন আরেকজনকে শিখিয়ে দিব। অন্যান্য দু'আ তো করবই, এই দু'আটা বেশি বেশি করব। দু'আর সময় যে কোনভাবে হোক, চোখের পানি ঝরিয়ে, কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, মাগফেরাত নিয়ে নিতে হবে।

অনুরূপভাবে শেষ দশকের প্রত্যেক রাতে অন্তত একবার দুই রাক'আত সালাতুত তাওবা নামে নামায পড়তে পারি। যে কোন সূরা দিয়েই এই নামায পড়তে পারি। নামাযের শেষে এস্তেগফার করি–

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

দুই রাক'আত সালাতুত তাওবা পড়ে এই এস্তেগফারটা আমরা যতবার পারি পড়তে থাকি। আল্লাহ তাওফীক দিলে ১০০ বার পড়ি। হাদীসে এসেছে, নবীজী দৈনিক ১০০ বার এস্তেগফার পড়তেন। অথচ তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁর এস্তেগফার মূলত তাঁর মর্যাদা বুলন্দির জন্য; তাঁর গুনাহ মাফ করানোর জন্য নয়। তাছাড়া নবীজীর এস্তেগফারের আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল উম্মতকে শিক্ষা দেয়া যে, দেখো, আমার তো গুনাহ নেই তবুও আমি আল্লাহর কাছে এস্তেগফার করছি, মাফ চাইছি। সুতরাং তোমরা যারা আমার উম্মত, যাদের কিনা খেয়ালে-বেখেয়ালে গুনাহ হয়ে যায়, তাদের তো আরো বেশি করে এস্তেগফার করা উচিত।

কোন গুনাহ হয়ে থাকলে সেই গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে। তাওবার জন্য চারটি শর্ত আছে। অর্থাৎ চারটি কাজ করলে তাওবা নিয়ম অনুযায়ী হবে, খাঁটি হবে এবং তাওবা কবুল হওয়ার আশা করা যাবে।

এক. মনে মনে লজ্জিত হওয়া যে, আল্লাহ! আপনার কত নেয়ামত উপভোগ করলাম আর কাজ করলাম শয়তানের কথামত। খাওয়ালেন, বাঁচালেন, পরালেন আপনি আর কাজ করলাম শয়তানের মর্জিমত। আমি কত বড় নেমকহারাম! এই ভেবে ভেবে লজ্জিত হওয়া।

দুই. গুনাহের কাজটি ছেড়ে দেয়া। কেউ গুনাহ চালু রেখেই তাওবা করছে। এই তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। তাওবার আগে গুনাহ বন্ধ করে দিতে হবে, বর্জন করতে হবে।

তিন. সামনের জন্য পাক্কা ইচ্ছা করা যে, ইনশাআল্লাহ আমি এ অন্যায় আর করব না। আমি 'ইচ্ছা করা' বলেছি, ওয়াদা করা বলিনি। ইচ্ছা করা আর ওয়াদা করার মধ্যে পার্থক্য আছে। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি গুনাহ ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা করে যে, আল্লাহ! ওয়াদা করলাম, এই গুনাহ আর করব না, কিন্তু পরে কোন কারণে আবার সে ঐ গুনাহে লিপ্ত হল তাহলে তার দু'টি গুনাহ হবে। একটা হল ঐ অন্যায় কাজের গুনাহ, আরেকটা হল ওয়াদা ভঙ্গ করার গুনাহ। এজন্য গুনাহ ছাড়ার ওয়াদা নয়, বরং দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করবে।

চার. যে গুনাহটি হয়ে গেছে তার যদি কোন কাফফারা থেকে থাকে তাহলে কাফফারা আদায় করতে হবে। যেমন, বিগত জীবনে নামায পড়েনি তাহলে উমরী কাযা পড়ে নিবে; রোযা রাখেনি, রোযার কাযা করবে; যাকাত দেয়নি,

হিসাব করে করে পেছনের বছরগুলোর যাকাত আদায় করে দিবে; দশ বছর আগে হজ্জ ফরয হয়েছিল, করেনি, এখন হজ্জ করে নিবে। অনুরূপভাবে কাউকে গালি দিয়েছে, লোকটি এখনো বেঁচে আছে, তার কাছে মাফ চেয়ে নিবে। মোটকথা এ রকম কিছু কিছু গুনাহ আছে, যেগুলোর কাফফারা আছে, খাঁটি তাওবা করতে হলে সেগুলোর কাফফারাও আদায় করতে হবে। আর যেসব গুনাহের কাফফারা নেই যেমন, টিভি দেখেছে, সিনেমা দেখেছে এগুলোর জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছেই মাফ চাইবে।

এই চারটি শর্ত আমরা মুখস্থ করে রাখি– গুনাহ ছেড়ে দেয়া, লজ্জিত হওয়া, সামনের জন্য না করার পাক্কা এরাদা করা, কাফফারা থাকলে কাফফারা আদায় করা। দুই রাক'আত সালাতুত তাওবা পড়ে এভাবে এই শর্তের সাথে আমরা তাওবা করি।

হাদীসে পাকে আছে, বান্দা যত গুনাহই করুক না কেন, আসমান সমান গুনাহই করুক না কেন, জান টান দেয়ার আগ পর্যন্ত তাওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাওবা ও এস্তেগফার এমন এক বারুদ, এমন এক আগুন যে, কারো গুনাহের স্তূপ আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, অতঃপর সে ঐ স্তূপে এস্তেগফারের বারুদ লাগিয়ে দিল, ব্যস এক সেকেণ্ডে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহগুলোকে ভস্ম করে দিবেন, মিটিয়ে দিবেন। গুনাহের চেয়ে এস্তেগফার অনেক বেশি শক্তিশালী। অনুতপ্ত বান্দার চোখের দুই ফোটা পানির মূল্য ও মূল্যায়ন আল্লাহর দরবারে অনেক বেশি। এটা জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দিতে পারে। আমরা এ মূল্যবান ফোটা দু'টোকে কাজে লাগাই। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারেও কৃপণতা করি, জমা করে রাখি, ওটা ফেলি না। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

আরেকটা কথা। আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকায় 'জুমাতুল বিদা' নামে একটা জিনিস প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। লোকেরা রমাযানের শেষ জুমু'আকে 'জুমাতুল বিদা' বলে অভিহিত করে। খুতবার সময় খতীব সাহেবরাও বারবার 'আল বিদা, ইয়া জুমাতুল বিদা' বলতে থাকে। কিন্তু আমরা কুরআন-হাদীসের কোথাও একথার কোন প্রমাণ পাইনি যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান শরীফের শেষ জুমু'আকে 'জুমাতুল বিদা' আখ্যায়িত করেছেন এবং জুমু'আর খুতবার ভেতর এই জুমু'আকে বিদায় জানিয়েছেন। সুতরাং এই কাজটাকে বিদ'আত মনে করতে হবে। শরীয়তে যার অস্তিত্ব নেই; নবীজীর যামানায়, খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় যে কাজের কোন অস্তিত্ব নেই, এরকম কোন কাজকে ইবাদত মনে করা, সওয়াবের কাজ মনে করা ভুল ও বিদ'আত। আমরা না জেনে অনেকেই এটা বলে থাকি, আলোচনাও করে থাকি, এটা পরিহার করতে হবে।

শ্রুতিলিখন : মাওলানা আব্দুল্লাহ ইউসুফ
শিক্ষার্থী, ইফতা ১ম বর্ষ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতথ্য

(ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য)

তারিখ	কার্যক্রম
৭ শাওয়াল	মাদরাসা খোলা, সকল জামাআতের ভর্তিচ্ছু নতুন ছাত্রদের ভর্তিফরম সংগ্রহ, তাইসীর থেকে নাহবেমীর পর্যন্ত ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (মৌখিক) ও ভর্তি।
৮ শাওয়াল	হিদায়াতুন্নাহব থেকে তাখাস্সুস পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা (লিখিত ও মৌখিক)।
৯ শাওয়াল	ফলাফল প্রকাশ ও ভর্তি (পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ঐ দিন ভর্তি হওয়া লাযেম, পরে সুযোগ থাকবে না)।
১০ শাওয়াল	মকতব, নাযেরা ও হিফয বিভাগে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের ভর্তিপরীক্ষা ও ভর্তি।

শর্তাবলী

১. ১৪৩৯-৪০ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু নতুন/পুরাতন সকল ছাত্রের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র এবং পাসপোর্ট সাইজ ২কপি ছবি লাগবে।

২. নতুন ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটি প্রশ্নের উত্তর উর্দূতে দিতে হবে।

পরীক্ষার বিষয়

ক্র.	জামাআত	বিষয়
০১	তাফসীরুল কুরআন বিভাগ	জালালাইন, আল-ফাউযুল কাবীর
০২	উলূমুল হাদীস বিভাগ	বুখারী ১ম, শরহু নুখবাতিল ফিকার
০৩	ইফতা বিভাগ	বুখারী, হিদায়া ৩য়, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৪	তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস)	মিশকাত, হিদায়া ৪র্থ
০৫	নিহায়ী সানী (মিশকাত)	জালালাইন, হিদায়া ১ম ও ২য়
০৬	নিহায়ী আউয়াল (জালালাইন)	শরহেবেকায়া, নূরুল আনওয়ার (কিতাবুল্লাহ)
০৭	সানাবী সানী (শরহেবেকায়া)	শরহেজামী, কানযুদ্দাকাইক
০৮	সানাবী আউয়াল (শরহেজামী)	কাফিয়া, কুদূরী
০৯	উস্তানী সালিস (কাফিয়া)	হিদায়াতুন্নাহব, ইলমুস সীগাহ
১০	উস্তানী সানী (হিদায়াতুন্নাহু)	নাহবেমীর, ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগঞ্জ
১১	উস্তানী আউয়াল (নাহবেমীর)	মীযান মুনশাঈব/ইলমুস সরফ ১ম ও ২য়, আরবী আদব
১২	ইবতিদায়ী সানী (মীযান)	তাইসীর, ফারসী কী পেহলী কিতাব
১৩	ইবতিদায়ী আউয়াল (তাইসীর)	উর্দূ কায়িদা, নাযিরা (গাইরে হাফেযদের জন্য)

বি.দ্র. উল্লিখিত জামাআতগুলোর লিখিত পরীক্ষার সাথে সাথে মতনখানীও পরীক্ষা হবে।

–জামি'আ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

ইসলাহী বয়ান

উলামায়ে আখেরাতের নিদর্শনাবলী

হযরতুল আল্লাম হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা.

২৪ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার বার্ষিক ফুযালা সম্মেলনে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর) দা. বা. অত্যন্ত সারগর্ভ এ বয়ানটি পেশ করেন। আলেম, তালিবে ইলম এবং জনসাধারণ-সবার প্রয়োজন বিবেচনায় বয়ানের অনুলিপি পরিবেশিত হলো। –সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর...

মুআয্যায ও আযীয আবনায়ে রাহমানিয়া! মহান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আজকের এই মজলিসে আবনায়ে রাহমানিয়া ও আ-বায়ে রাহমানিয়াকে একত্র হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

মায়ের আঙ্গিনায় সকল সন্তানের একত্র হতে পারা অপরিসীম আনন্দের বিষয়। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রবাস থেকে যখন কোন সন্তান বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসে তখন সন্তান এবং মাতা-পিতা সবাই সীমাহীন আনন্দিত হয়। রাহমানিয়ার সন্তানরাও দীর্ঘদিন পর তাদের মায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছে। এই মা সাধারণ কোন মা নয়; মাদারে ইলমী, ইলমী সূত্রে মা। আর যাদেরকে আ-বায়ে রাহমানিয়া বলা হয়, তারা হলেন ইলমী সূত্রে বাবা।

আপনাদের সামনে এখন যে বসে আছে, সে হলো সবচে' অযোগ্য বাবা। (আল্লাহর পানাহ্, তিনি অযোগ্য হতে যাবেন কেন? তিনি তো উস্তাযুল আসাতিযা। বস্তুত এটা তার আমিত্ব বিলোপ ও বিনয় প্রকাশ –সম্পাদক) তবে পিতা অযোগ্য হলেও তিনি কিন্তু এই কামনাই করেন যে, তার সন্তান যেন হয় পরিপূর্ণ ও যোগ্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের আবনায়ে রাহমানিয়ার দীনী খেদমত ও কার্যক্রমের কথা শুনে আমি এ ভেবে আনন্দিত হই যে, আমার মতো অযোগ্য পিতার সন্তানরাও যোগ্যতা অর্জন করছে এবং এর মাধ্যমে আমি যোগ্য সন্তানদের পিতা হতে পেরেছি এবং আমার মতো অযোগ্যের উসীলায় আবনায়ে রাহমানিয়া নিজ নিজ এলাকায় বরং সারা পৃথিবীতে ওয়ারাসায়ে আম্বিয়ার সুমহান দায়িত্ব পালনের তাওফীক পাচ্ছে। আসলে তাদের এই যোগ্যতার মৌলিক মাধ্যম হলো উলূমে নববী। উলূমে নববীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণেই তারা ওয়ারাসায়ে আম্বিয়া হতে পেরেছে।

মানুষ হওয়ার মাপকাঠি

এই পৃথিবীর মূল চালিকাশক্তি হলো, আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতি। মানুষ হলো বর, আর অন্য সকল মাখলুক বরযাত্রী। মানবজাতির উসীলাতেই অন্যান্যদের আগমন ও মেহমানদারী।

কিন্তু মানুষের মধ্যেও কি সকল মানুষ একই মর্যাদার? যে সকল মানুষ নিজেদের জীবনে ইনসানিয়্যাত ও মনুষ্যত্ব সঠিকভাবে ধারণ করতে পেরেছে তারা এবং অন্যরা কি সমান? কিছুতেই নয়। বরং ইনসানিয়্যাতের ধারক-বাহক মানুষরাই প্রকৃতপক্ষে বর। আর যে সকল মানুষ ইনসানিয়্যাত ও মনুষ্যত্ব সঠিকভাবে ধারণ করতে পারেনি, তারাও অন্যান্য প্রাণীর মতো বরযাত্রী। বরের উসীলায় তারা এ পৃথিবীতে আগমন করেছে এবং খেয়ে পরে বেঁচে আছে। তাদের চলাফেরা, আনন্দ-উল্লাস সবকিছুই বরের উসীলায় চলছে। এসব মানুষ এবং হায়াওয়ানের মধ্যে আদতে কোন পার্থক্য নেই।

বিশিষ্ট আলেম ও বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-কে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো। প্রথম প্রশ্নটি ছিলো, প্রকৃতপক্ষে ইনসানিয়্যাতের ধারক মানুষ কারা? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'উলামায়ে কেরাম'।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিলো, এই পৃথিবীতে বাদশাহ কারা? তিনি বলেছিলেন, যারা যাহেদ ও দুনিয়া বিমুখ তারাই আসল বাদশাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর সেই ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। তিনি বড় মুহাদ্দিস ও আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধ হওয়ার পর একবার বাগদাদ আসছিলেন। বাদশাহ হারুনুর রশীদ শাহী অট্টালিকায় স্ত্রীর সঙ্গে খোশালাপে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ কানে এলো। খলীফা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, না জানি রাজ্যের কোথাও বিদ্রোহ সৃষ্টি হলো! অবস্থা যাচাইয়ের জন্য তিনি লোক পাঠালেন। জানা গেলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বাগদাদে আগমন করছেন। তার অভ্যর্থনায় হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে। সেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছেন, এর জবাবে সমবেত লোকজন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলাতেই সেই উচ্চ আওয়াজ সৃষ্টি হয়েছে। একথা শুনে খলীফার স্ত্রী বললেন, আসল রাজত্ব তো আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের হাতে! কেননা তার কব্জায় রয়েছে মানুষের অন্তর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের কাছে তৃতীয় প্রশ্ন ছিলো, কমীনা ও নীচুপ্রকৃতির লোক কারা? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, 'যারা দীনকে বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জন করে তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট।'

শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর কথা অনুযায়ী উলামায়ে কেরাম হলেন সঠিক অর্থে মানুষ। এখানে চিন্তার বিষয় হলো, কেন ইলমকে সত্যিকার মানুষ হওয়ার মাপকাঠি বানানো হলো? এর উত্তর হলো, অন্য সকল প্রাণী থেকে মানুষের বিশেষত্ব শুধু ইলমের কারণে। অন্যথায় শারীরিক শক্তির দিক থেকে একটা হিংস্র বাঘের শক্তি মানুষ থেকে অনেক বেশি। একেকটা হাতীর স্বাস্থ্য মানুষ থেকে অনেক বেশি। একটা গরুও মানুষ থেকে অনেক বেশি খেতে পারে। একটা চড়ুই পাখির মধ্যেও মানুষ থেকে অনেক বেশি সহবাসের শক্তি রয়েছে। সুতরাং একমাত্র ইলমে নববীর কারণে মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেহেরবানী করে আবনায়ে জামি'আ রাহমানিয়াকে সে ইলমে নববীর ধারক-বাহক বানিয়েছেন, আলহামদুল্লিাহ; জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদেরকে ওয়ারাসায়ে আম্বিয়ার দায়িত্ব পালনে অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শুধু ইলম যথেষ্ট নয়

তবে শুধু আলেম হয়ে গেলেই মানুষ সত্যিকারের মানুষে পরিণত হবে না। কারণ, আলেমদের মধ্যেও দু'টি প্রকার

রয়েছে। **ক.** উলামায়ে দুনিয়া। **খ.** উলামায়ে আখেরাত। উলামায়ে দুনিয়াকে উলামায়ে সূ বলা হয়; যারা ইলমের মাধ্যমে দুনিয়াবী সম্পদ, পদ-পদবী আর স্বার্থ উদ্ধার করে থাকে।

আর উলামায়ে হক্কানী হলেন উলামায়ে আখেরাত। তাঁদের মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্য মানুষের হিদায়াত হবে। এ ধরনের আলেম সম্পর্কেই হযরত উমর রাযি. বলেছেন, একজন আলেমের ইন্তেকালে যে পরিমাণ আফসোস হবে, হাজারো আবেদ মারা গেলেও সে পরিমাণ আফসোস হবে না।

উলামায়ে হক্কানীর আলামত

বুযুর্গানে দীন উলামায়ে আখেরাতের কিছু আলামত বর্ণনা করে গেছেন।

প্রথম আলামত হলো, ইলম দ্বারা তাদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্য থাকে না। তারা ইলমকে দুনিয়ার স্বার্থে ব্যয় করে না। আমাদের আকাবির হাযারাত– যাদের নাম শুনলে ভক্তি-শ্রদ্ধায় আমাদের অন্তর ভরে যায়– তারা এমনই ছিলেন।

দ্বিতীয় আলামত হলো, উলামায়ে আখেরাত ইলম মোতাবেক আমল করে থাকেন। ইলম মোতাবেক আমল করা খুব জরুরী। আমি মাদরাসার পরিচালক, মসজিদের ইমাম, ভালো বক্তা– যাই হই না কেন, যদি আমার আমল ঠিক না থাকে তাহলে জনগণের সামনে, তলাবাদের সামনে প্রদত্ত আমার সব আকর্ষণীয় বয়ান বেকার হয়ে যাবে, ভালো কোন তাসীর শ্রোতাদের মধ্যে পড়বে না। আসাতিযায়ে কেরামের বয়ানের প্রভাব সাধারণ শ্রোতা ও তলাবাদের মধ্যে তখনই পড়বে, যখন বয়ানকারীর আমল কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হবে।

ইলম মোতাবেক আমলের ক্ষেত্রে আবনায়ে রাহমানিয়াকে সবার আগে এগিয়ে আসা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলার রহমতে জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার যে সুনাম রয়েছে, সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এর বিকল্প নেই। আসলে সুনাম কিভাবে হয়? প্রচারের মাধ্যমে? কখনোই নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা তো সুনামের ব্যবস্থা করেন আমলের মাধ্যমে।

ইমাম গাযালী রহ. বে-আমল আলেমের উদাহরণ দিয়েছেন ঐ সৈনিকের সাথে, যার কাছে শত্রুকে মোকাবেলা করার মতো সবরকমের হাতিয়ার আছে; কিন্তু শত্রুর আক্রমণের পর সে একটা অস্ত্রও ব্যবহার করলো না। কী মর্মান্তিক পরিণতি হবে ঐ সৈনিকের! নিশ্চয়ই সে বেঘোরে মারা পড়বে।

মুসলিম জাতির জন্য কুরআন-সুন্নাহর চেয়ে বড় কোন অস্ত্র নেই। তারা যদি সে অস্ত্র ব্যবহার না করে, ইলম অনুযায়ী আমল না করে শুধু মানুষের মধ্যে বয়ান করে বেড়ায় তাহলে তাদের পরিণতিও এমন মারাত্মক ও ভয়াবহ হবে। বিশেষ করে জনগণের জন্য আদর্শ হতে হলে আলেমদের আমল হতে হবে সর্বোত্তম।

তৃতীয় আলামত হলো, গায়রে মুফীদ ও অপকারী ইলম থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে গায়রে মুফীদ ইলম থেকে পানাহ চেয়েছেন।

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع

চতুর্থ আলামত হলো, উলামায়ে কেরাম দুনিয়াবী শান-শওকত বেশি গ্রহণ করেন না। তারা আরাম-আয়েশ, সাজসজ্জা ও বিলাসিতায় লিপ্ত হন না। আমাদের আকাবির রহ. ছিলেন এ ব্যাপারে অনুসরণীয়। বিলাসিতা, সাজ-সজ্জা ও শান-শওকত এড়িয়ে তারা অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। আমাদের নিকট-অতীতের আলেমে রব্বানী হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর জীবনও ছিলো এমনই সাদামাটা ও বাহুল্যবর্জিত। কত বড় আল্লাহর ওলী ছিলেন! জীবনের শেষপর্যায়ে এসে জাতীয় নির্বাচনও করেছেন, মহাসমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু কোন পাণ্ডিত্য দেখাননি; সরল সাধারণ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছেন। অথচ তার কথা বলার সময় মানুষের আগ্রহ আর উৎসাহ ছিলো নজিরবিহীন। আসলে এটা ছিলো তার আমলের তাসীর। আলেমে আখেরাত হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলাই তার কথার মধ্যে এত প্রভাব সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম আলামত হলো, তাদের কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তাহকীক ছাড়া জবাব দেন না। তৎক্ষণাৎ বলতে না পারলে সময় চেয়ে নেন অথবা অন্য কারো হাওয়ালা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ছিলেন ইলমের সমুদ্র। তাকে একবার একটা মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ মাসআলা তোমরা মাসরুককে জিজ্ঞাসা করো। পরবর্তীতে দেখা গেলো, মাসরুক রহ. যে জবাব দিয়েছেন সেটা ইবনে আব্বাস রাযি.-এর জানা ছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি জবাব দেননি। আজকাল তো গণহারে মুফতী হচ্ছে; দাওরায়ে হাদীসে যে ছাত্রটি অনুত্তীর্ণ হয়েছে তার জন্যও কোথাও না কোথাও 'মুফতী' হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে! এখন এই মুফতীরা চিন্তা করে, আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি তাহলে তো আমার মুফতী নামের বদনাম হয়ে যাবে। সেজন্যে না জানা থাকলেও সে গোলমোল করে একটা জবাব দিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ আলামত হলো, উলামায়ে আখেরাত দেশের শাসক এবং রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকবে। বর্তমানে এটা খুব চলছে। সব জায়গায় লোভ-লালসা ছেয়ে গেছে। আলেমরা দুনিয়ার চাকচিক্যের লোভে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে না-হক কথাও বলে ফেলে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

সপ্তম আলামত হলো, বাহ্যিক ইলমের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ইলম দ্বারাও নিজেকে সুসজ্জিত করা। বর্তমানে আত্মশুদ্ধির বড় অভাব আমাদের মধ্যে। এ কারণে অনেক বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর সে হাদীসের কথা স্মরণ করি, যে হাদীস বলার সময় তিনি শুধু 'ক্বালা রাসূলুল্লাহ' বলেই বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ এলে বলতেন, 'ক্বালা রাসূলুল্লাহ' অমনি আবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এভাবে অনেকবার বেহুঁশ হওয়ার পর তিনি সে হাদীস বর্ণনা করতেন। সেই হাদীসে হাশরের ময়দানে উপস্থিত তিন প্রকার লোকের কথা বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বাহ্যিকভাবে অনেক বড় বড় নেককাজ আঞ্জাম দিয়েছিলো, কিন্তু তাদের আত্মশুদ্ধি আর ইখলাস না থাকার কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে শুনে এক তাবেয়ী হযরত মু'আবিয়া রাযি.-এর কাছে বর্ণনা করেছিলেন। হযরত মু'আবিয়া এ হাদীস শুনে এমন বুকফাটা চিৎকার শুরু করেছিলেন যে, লোকেরা তার মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছিলো।

এ হাদীসে যে ব্যক্তির সর্বপ্রথম জাহান্নামের ফায়সালার কথা বলা হয়েছে সে ছিলো আলেম। আত্মশুদ্ধি আর ইখলাস না থাকার কারণে তার ইলম তাকে কোন উপকার করতে পারবে না। এজন্য আমাদেরকে নিজেদের ইসলাহে বাতেনের জন্যে কোন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। অন্তর থেকে আখলাকে রাযীলা (বদগুণ) দূর করে আখলাকে হামীদা (সৎগুণ) হাসিল করতে হবে। এটা অত্যন্ত জরুরী একটা বিষয়। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এটা থেকে বঞ্চিত।

অষ্টম আলামত হলো, তার মাঝে তাওয়াযু অর্থাৎ বিনয়ের গুণ থাকবে, যেমন তাওয়াযু ও বিনয় ছিলো আমাদের আকাবিরদের মধ্যে। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-কে দেখেছি, মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহ.-কে দেখেছি, অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরামকেও দেখেছি, তাদের মধ্যে কত বেশি পরিমাণে তাওয়াযু বিদ্যমান ছিলো!

হাফেজ্জী হুযূরকে অনেক সময় ছাত্ররা যদি এমন কোন প্রশ্ন করতো যেটার উত্তর ফিলহাল তাঁর যেহেনে নেই, তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতেন, 'তোমরা একটু বসো, আমি উত্তরটা জিজ্ঞাসা করে আসি।' এরপর তিনি চলে যেতেন তার একসময়ের ছাত্র মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে। মুহাদ্দিস সাহেব হয়তো তখন দরসে আছেন। হাফেজ্জী হুযূর রহ. দরসের মধ্যে, ছাত্রদের সামনেই মুহাদ্দিস সাহেবের কাছে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করতেন। তারপর জবাব শুনে এসে নিজের ছাত্রদেরকে বলে দিতেন।

আমাদের পূর্বসূরীদের এরকম বহু ঘটনা উল্লেখ করা যাবে। আমরা তাদের সন্তান। তোমরাও তাদের রুহানী সন্তান অথবা দৌহিত্র। হযরত মুহাদ্দিস সাহেবের মধ্যে এত বেশি সাদেগী ছিলো যে, তিনি কখনো নিজেকে মুহতামিম বলে পরিচয় দিতেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'নিয়ম হিসেবে একজনের নাম থাকতে হয়, সে জন্যে আমার নাম আছে। কিন্তু মাদরাসা তো চলে সবার সম্মিলিত মাশওয়ারায়।'

হাদীসে আছে,

قال عمر وهو على المنبر: أيها الناس، تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير، وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير، وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير

যে আল্লাহর জন্য নত হয় আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। তাওয়াযুর কারণে কেউ কোনদিন ছোট হবে না। সকল ইখতেলাফ, হিংসা, বিদ্বেষ হয় তাকাব্বুরের কারণে। হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, 'ইত্তেফাকের মূল ভিত্তি হলো তাওয়াযু'। কোন প্রতিষ্ঠান, ইলমী মারকায, দাওয়াতী মারকাযে তাওয়াযু থাকলে ইখতেলাফ হতে পারে না। উলামায়ে আখেরাত হতে চাইলে আমাদেরকে তাওয়াযুর সিফাত গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ মানুষের কর্তব্য

ইলমের মাধ্যমেই মানুষ এবং হায়াওয়ানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো, নিজে আলেম হতে না পারলেও আলেমদের সোহবতে এসে জরুরী ইলম অর্জন করা। উলামায়ে কেরামের সাথে মহব্বত রাখা এবং জগতের সকল কিছু থেকে তাদেরকে বেশি মর্যাদা দেয়া। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, 'উলামায়ে কেরাম না থাকলে সাধারণ লোকেরা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও খারাপ হয়ে যেত।'

বর্তমানে কিছু মানুষ উলামায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে চাইছে। এর কারণ হলো জাগতিক শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব– অহঙ্কার। ঐ অহঙ্কারের কারণে আজ তারা তিন দিন, চিল্লা, তিন চিল্লা দিয়েই মনে করছে দীনের সকল কাজ তো আমরাই করছি। আলেমরা আর কী করে!

দুঃখজনক হলো, এসব জাহেলী কথায় মদদ যোগাচ্ছে একশ্রেণীর আলেম। তারচেয়েও দুঃখজনক হলো, আবনায়ে জামি'আর কেউ কেউ নাকি উলামায়ে হক্কানীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এসব মূর্খতায় তাল দিচ্ছে। দীনী কাজের মুখোশধারী ব্যক্তিপূজারী একদল লোকের খপ্পরে পড়ে তারা নিজেদের ঈমান-আমল এবং স্বকীয়তা বরবাদ করছে। আরো ভয়ানক ব্যাপার হলো, সেসব 'আবনা' নাকি আবার এখানকার উস্তাদদের সাথেও সম্পর্ক রাখে। উপর দিয়ে সম্পর্ক রাখে, আর গোপনে আলেমবিদ্বেষীদের মদদ করে।

অনেকে বলে, সবাই তো তাদের সাথে আছে। থাকুক; চাপাবাজী আর চাপলুসী করে লোকদেরকে নিজের পক্ষে নেয়া আমরা পছন্দ করি না। নিজেদের কাজ আর আমল-আখলাক দ্বারাই লোকেরা আমাদের পক্ষে আসবে।

এসব লোকের কোন খবরই নেই যে, বর্তমানের প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ কাদের মাধ্যমে এসেছে! আরে, দেওবন্দী সিলসিলার আলেমদের মাধ্যমেই তো তাবলীগ এসেছে। এদেরকে বাদ দিয়ে তোমরা কিভাবে তাবলীগ করবে? এটাতো ইয়াহুদীদের এক ঘৃণ্য চক্রান্ত। এ চক্রান্তের পেছনে পড়ে তারা কোথায় ছুটছে তা কি একবারও ভেবে দেখেছে? এ ষড়যন্ত্রের খপ্পরে কেউ পড়ে গেলে তার দুনিয়া-আখেরাত সব বরবাদ হয়ে যাবে।

উলামায়ে কেরামের করণীয়

উলামায়ে কেরামের করণীয় হলো, ইলমের সকল শর্ত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা অর্জন করা এবং হক্কানী আলেম হওয়ার শর্তসমূহ পূরণ করা। সবসময় হকের দাঈ হওয়ার চেষ্টা করা। মন্দ কোন বিষয়ের মাদঊ না হওয়া। সবসময় নিজের পদস্খলনের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা। হযরত হাসান বসরী রহ. একবার মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। বৃষ্টির দিন ছিলো। তিনি দেখলেন, একটা ছোট্ট মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'সাবধানে চলো, যেন পিছলে না যাও।' মেয়েটি জবাব দিলো, 'আপনারও সতর্কতার সাথে চলা উচিৎ। কারণ আমি হোঁচট খেলে আমার একার ক্ষতি হবে, পক্ষান্তরে আপনার পদস্খলন হলে পুরো জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সত্যিই, একজন আলেমের পদস্খলন মানে সারা দুনিয়ার পদস্খলন। এ জন্যই বলা হয়, موت العالِم موت العالَم (আলেমের মৃত্যু যেন পৃথিবীরই মৃত্যু)। সুতরাং আমাদের যেন পদস্খলন না হয়।

শেষকথা

আজকের আলোচনায় উলামায়ে আখেরাতের যে সব আলামত বলা হয়েছে, সেগুলো ধারণ করে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হক্কানী আলেম হওয়ার তাওফীক দান করুন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীনের সকল কাজে মজবুত ও অটল রাখুন। জনসাধারণকে সহীহ পথে আনার জন্য উলামায়ে কেরাম যেন হিম্মতের সাথে কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করতে পারেন আল্লাহ তা'আলা সে তাওফীক দান করুন।

জামি'আর আসাতিযা এবং তলাবাদের জন্যও আপনাদের কাছে দু'আ চাই। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তলাবাদের আমানত যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

অনুলিখন : মাওলানা ইরফান জিয়া
শিক্ষার্থী : ইফতা বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

আ ত্ম জী ব নী

দারুল উলূম করাচির মুখপত্র মাসিক আল-বালাগ মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ধারাবাহিক আত্মজীবনী 'ইয়াদেঁ' প্রকাশ করছে। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সম্মতিক্রমে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার মুখপত্র দ্বি-মাসিক রাবেতা এখন থেকে ইয়াদেঁ-এর ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ করবে। অনুবাদ করেছেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা সমাপনকারী, দারুল উলূম করাচির ইফতা বিভাগে অধ্যয়নরত ***মাওলানা উমর ফারুক ইবরাহীমী।***

ইয়াদেঁ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

(পূর্বপ্রকাশের পর)

আমার মুহতারামা আম্মাজান মরহুমা নাফিসা খাতুন, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা তাঁর উপর রহমতের বারি বর্ষণ করুন! নিঃসন্দেহে একজন মহীয়সী মা এবং অনুকরণীয় সংসারী নারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দেওবন্দের প্রসিদ্ধ 'আনসারী' বংশোদ্ভূত। দুর্দিন কিবা সুদিনে, সর্বস্ব সমর্পণ করে তিনি যেমন করে আব্বাজানের পাশে থেকেছেন, শুধু এ বিষয়টিই বিশদ আলোচনার দাবিদার। আম্মাজানের সবিস্তর জীবন-বৃত্তান্ত আমি তাঁর ইন্তিকালের পর লিখেছিলাম। সেটি এখন আমার লেখা 'নুকুশে রফতেগা' কিতাবের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি অতিশয় ইবাদতগোজার এবং দুনিয়া-বিরাগী ছিলেন। বার্ধক্যজনিত কারণে হুঁশ-জ্ঞান বিলোপ হওয়া পর্যন্ত কখনোই তাঁর নামায, যিকির, নফল ইত্যাদি কাযা হয়নি।

আমাদের জন্য তাঁর আপাদমস্তক পরম মায়া-মমতা, অকৃত্রিম স্নেহ-আদর এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় পূর্ণ ছিলো। দিনরাতের প্রায় পুরোটা সময়জুড়ে, ক্লান্তিহীনভাবে তিনি আমাদের আরাম-আয়েশের ফিকিরে বিভোর থাকতেন। আমাদের সুখের জন্য নিজের সর্বস্ব হাসিমুখে বিলিয়ে দিতে আম্মাজান বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করতেন না। স্বভাবত সব সন্তানের প্রতিই তাঁর স্নেহ-মমতা সমানভাবে ছিলো। তবে সর্বকনিষ্ঠ হওয়ায় আমার প্রতি হয়তো তার আদর-সোহাগ একটু বেশিই ছিলো। ফলে আমি যথেষ্ট বড় হওয়া পর্যন্ত খাবার তাঁর হাতেই খেতাম। তিনি লোকমা বানিয়ে মুখে তুলে দেয়া অবধি আমি খাবার খেতাম না। আশপাশের কারো বাসায় গেলে, আমি তাঁর সঙ্গী হবো না–এটা ছিলো অসম্ভব।

সে যুগে দেওবন্দের মতো ছোট শহরে অটোকার, মোটরচালিত যানবাহনের কথা তো কল্পনাই করা যেতো না। যারা কখনো দেওবন্দের বাইরে যাননি, তারা হয়তো জীবনে মোটরযানই দেখেননি। যাতায়াতের জন্য শেষভরসা ছিলো ঘোড়ার গাড়ী। এতে চড়েই শহরের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের কাজ সারা হতো। তা-ও সেটা ছিলো শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। মুসলিম নারীদের জন্য বোরকাবৃত অবস্থায়ও ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া অত্যন্ত দোষণীয় মনে করা হতো। মহিলাদের ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে কোথাও যাবার প্রয়োজন হলে, তারা গাড়ীর চারপাশ পর্দায় ঢেকে, বোরকাবৃত হয়ে পর্দার আড়ালে বসতেন। নতুবা এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় যাতায়াতের জন্য পালকির ব্যাবহারই ছিলো বেশি। দেওবন্দের ভাষায় পালকিকে ডুলি বলা হতো। দু'জন ব্যক্তি সেই ডুলি বা পালকি কাঁধে বহন করতেন। বহনকারীদেরকে কুহার বলে ডাকা হতো। নারীদের পালকিতে চড়ে সফরের প্রয়োজন হলে, কুহার বা পালকিবাহক পালকিটি তাদের ঘরে রেখে নিজেরা বাইরে চলে আসতেন। তারপর মহিলারা পালকিতে উঠে বসতেন। সফরকারী মহিলারা কখনো সঙ্গে করে পাথর উঠিয়ে নিতেন, যেন কুহার পালকি উঠানোর সময় অন্দরে থাকা নারীর সঠিক ওজন আন্দাজ করতে না পারে। তবে কখনো ছোট বাচ্চাদের মায়ের সাথে পালকিতে চড়ার শখ হতো, তখন আর ভিন্ন করে পাথর রাখার প্রয়োজন হতো না। আমার আম্মা নানাবাড়ি যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে উঠিয়ে নিতেন। পালকির চারপাশ পর্দাবৃত থাকার দরুন কিছুই ঠাহর করতে পারতাম না–কোন পথে, কিভাবে যাচ্ছি। তবে ঝাঁকুনি খেয়ে পালকি যখন এপাশ ওপাশ দুলতো, আমরা যারপরনাই প্রমোদিত হতাম। দেওবন্দের ভাষায় এটাকে বলা হতো–

بڑی اچھی باریاں آرہی ہیں !

অর্থাৎ 'পালকির দুলকি চাল দারুণ উপভোগ করছি।'

আব্বাজান রহ.-এর সন্তান-সন্ততি বলতে ছিলাম আমরা নয় ভাই-বোন। সবার বড়বোন ছিলেন মরহুমা মুহতারামা নাঈমা সাহেবা। আমরা তাঁকে আপাজান বলে ডাকতাম। তাঁর বিয়ে আমার পৃথিবীতে আসার আগেই হয়েছিলো। তিনি যদিও সদা হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন এবং সব ভাই-বোনদের সাথে তাঁর সম্পর্কও মধুর ছিলো, তথাপি শিশুকাল থেকে তাঁকে নিয়ে আমার কচিমনে এক অজানা ভয় দানা বেঁধে ছিলো। অনেকাংশে সেটা আব্বাজানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এটার কারণ খুবসম্ভব এমন কিছু হতে পারে–

তাঁর বাসা ছিলো আমাদের বাসার অদূরে 'টিলা' নামক মহল্লায়। সেখানে একটি ছোট্ট টিলা ছিলো। আমাদের কাছে সেটা পাহাড়ের চেয়ে কোন অংশে কম মনে হতো না। আমাদের বোন টিলার উপরে একটি বাসায়, তার স্বামী হাকিম সায়্যিদ শরিফ হুসাইন সাহেবসহ থাকতেন। আপাজানের তবিয়ত, মেজাজের প্রখরতা, সংবেদনশীলতা দেখে তাকে 'নবাবযাদী' মনে হতো। তাঁর বাসায় পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বও স্বাভাবিকের চেয়ে বহুগুণে বেশি ছিলো। বিছানায় সামান্য খড়কুটোও আপাজানের কাছে অসহ্যরকম ছিলো।

আমি বড়দের সাথে আপার বাসায় গেলে, সমবয়সী ভাগ্নে-ভাগ্নিদের সঙ্গে খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে যেতাম। একবার খেলতে খেলতে কখন যেন আমি পায়ের ধুলোবালি সমেত তাঁর বিছানায় উঠে পড়েছিলাম। এটা দেখে তিনি চোখ পাকিয়ে বললেন–

بس قدم رنجہ نہ فرماؤ

'ব্যস! এবার আসতে পারো'

قدم رنجہ শব্দটি আমি তখনি প্রথম শুনি। কিন্তু এটার অর্থ ও মর্মার্থের চেয়ে শুধু তাঁর ভয়দ চাহনিই আমাকে ভীষণ রকম কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। তার রেশ দীর্ঘকাল পর গিয়ে কিছুটা কেটেছিলো। তখন আমার এটাও জানা ছিলো না যে, এভাবে চোখ পাকিয়ে তাকানোকে گھورنا (ঘোরনা) বলে। পরবর্তীকালে আপাজান যখন অন্য ভাই-বোনদেরকে এই ঘটনা শুনিয়েছেন, তখনি আমি گھورنا শব্দটি প্রথম শুনি। আমার এই বড়বোন মাত্র ৩৪ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তখন আমি ১৩ বছর বয়সী ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন!

বড় আপা আর্থিক দীনতা সত্ত্বেও জীবনভর আপন ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বকীয়তা পূর্ণরূপে বজায় রেখে চলেছেন। নিজের অভাব-অনটন কখনোই কাউকে বুঝতে দেননি। তাঁর মত এমন আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন দ্বিতীয় আরেকজন মহিলা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আপাজানের ব্যাপারে একটি ঘটনা বিশেষভাবে বলার জন্য আমার যেন তর সইছে না!

যেমনটা আমরা পূর্বে বলে এসেছি যে, বিবাহোত্তর জীবনে তিনি ভীষণরকম দীনহীন ছিলেন। আর্থিক অবস্থা ছিলো নিতান্তই করুণ। এমতাবস্থায় একবার তিনি আব্বাজানের কাছে আরয করলেন–

আপনি আমার জন্য দু'আ করে দিন, আল্লাহ যেন আমাকে হজ্জের সৌভাগ্য নসীব করেন।

আব্বাজান বললেন, সত্যিই তোমার হজ্জে যাওয়ার আগ্রহ আছে?

আপাজান 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিলেন।

আব্বাজান বললেন, নাহ, তোমার হজ্জের শওক নেই!

আপাজান বললেন, আব্বা! সত্যিই আমি আগ্রহী; অনেকদিন ধরে হজ্জে যাবার জন্য মুখিয়ে আছি।

তখন আব্বাজান জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমি এ কাজের জন্য কত রুপি সঞ্চয় করেছো?

আপাজান 'না' সূচক জবাব দিলেন।

আব্বাজান বললেন, তার মানে তোমার আগ্রহ শুধু মুখে মুখেই! বাস্তবিকই তোমার শওক থাকলে তুমি কিছু না কিছু অবশ্যই সঞ্চয় করতে!

আপাজান ওজর পেশ করে বললেন, প্রয়োজনীয় খরচাদি শেষে কিছু বেঁচে থাকলেই তো আমি সঞ্চয় করবো!

আব্বাজান বললেন, তা তুমি কি এক আনাও বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম?

আপাজান বললেন, এটা তো পারবো, কিন্তু এই দিয়ে হজ্জের রাহাখরচ কিভাবে সম্ভব!?

আব্বাজান বললেন, বান্দা যখনি সাধ্যমতো নেক কাজের প্রতি কদম উঠায়–

প্রথমত: আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে নুসরত করেন।

দ্বিতীয়ত: যদি তার নেক ইচ্ছা আলোর মুখ না-ও দেখে, আল্লাহ্ চাহে তো তবুও সে সওয়াব পেয়ে যাবে। কিন্তু কদম উঠানো ছাড়া শুধু আশা জিইয়ে রেখে তো আর কাজ হবে না।

এ ঘটনার পর লম্বা সময় অতিক্রান্ত হয়ে ১৯৫৬ হিজরী সনে আপাজানের ইন্তেকাল হয়। ইন্তেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া আসবাবপত্রের মধ্যে কাপড়ের একটি ছোট্ট থলের সন্ধান মিলেছিলো, যার উপর লেখা ছিলো, 'হজ্জের জন্য জমানো অর্থ' থলেটির ভেতরে পঁয়ষট্টি রুপি পাওয়া গিয়েছিলো। আব্বাজান থলেটি দেখার পর, অনিচ্ছায় তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তখনি তিনি উল্লিখিত পুরো ঘটনাটি আমাদের শুনিয়েছেন। পরবর্তীতে জমানো পয়সাগুলো তিনি আপাজানের হজ্জে বদলের কাজে ব্যয় করেছেন। এভাবে তাঁর বদলী হজ্জ আদায় করানো হয়।

একবার আব্বাজান হজ্জের মৌসুমে আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। কিছু সময়ের জন্য তাঁকে তন্দ্রা পেয়ে বসলো। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, আপাজান আরাফার পাহাড় 'জাবালে রহমতে' আরোহণ করছেন! এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই বান্দির হজ্জ আদায় করিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর উপর সর্বদা রহমতের বারি বর্ষণ করুন। আমীন! !

দ্বিতীয় বোন মুহতারামা আতিকা খাতুন মাদ্দাযিল্লুহা। মাশাআল্লাহ! তিনি অত্যন্ত ইবাদতগোজার এবং সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি জীবনযাপনের অধিকারী এক মহীয়সী নারী। তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর হাতে বাইআতের সৌভাগ্যও অর্জন করেছেন। আজ (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঈসায়ী, ২৫ জুমাদাল উলা ১৪৩৭ হিজরী সন) আমার জানামতে বর্তমান পৃথিবীতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় আরেকজন নেই, যিনি সরাসরি হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর হাতে বাইআতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

হযরত আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর মা'মুল ছিলো, তিনি প্রতি রমাযানে সপরিবারে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর খেদমতে (থানাভবন) হাজির হতেন, তাঁর সোহবতে সময় কাটাতেন। সে মানসে অধিকাংশ সময় খোদ হযরতের বাড়ির দোতলার একটি কামরায় তিনি অবস্থান করতেন। সেই কামরাটির নকশা ছিলো এমন–

হযরত থানবী রহ.-এর কামরার সামনে একটি উঠোন ছিলো। উঠোনের ঠিক শেষ প্রান্তে সিঁড়ি ছিলো উপরের কামরায় যাবার জন্য। টয়লেট যেহেতু পুরো বাড়িতে একটাই ছিলো, তাই হযরত থানবী রহ. ব্যবস্থাপনা এভাবে করে রেখেছিলেন যে, উঠোনের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ল্যাম্প ঝুলিয়ে রাখতেন। ল্যাম্পটি নির্ধারিত জায়গায় বিদ্যমান থাকার অর্থ ছিলো, টয়লেট এখন উপরের কামরায় অবস্থানরতদের জন্য খালি আছে। সেখানে পর্দারও পূর্ণ ব্যবস্থাপনা থাকতো। ল্যাম্পটি নির্দিষ্ট স্থানে না থাকলে বুঝে নিতে হতো, টয়লেট এখন ব্যস্ত।

আমার এই বোন (আতিকা সাহেবা) শুনিয়েছেন–

"উপরের কামরায় থাকাকালীন আব্বাজান অত্যন্ত আদব ও ইহতিরামের সাথে থাকতেন। আমাদের ছোটদেরকে সব সময় সামান্যও শোরগোল করতে বারণ করতেন। বলতেন, কোনভাবেই যেন আমরা হযরতের কষ্টের কারণ না হই। বয়সে আমি ছোট্ট ছিলাম। তখনো আমার পর্দার বয়স হয়নি। একদিন আব্বাজান আমাকে ডেকে বললেন, যাও! হযরতকে গিয়ে বলো, ''আপনি আমাকে বাইআত করে নিন।'

প্রথমে আমি এটিকে নিছক মজাক মনে করেছিলাম যে, এমন ছোট বাচ্চাদের আবার কিভাবে বাইআত করে?

কিন্তু আব্বাজান যখন দ্বিতীয়বার বললেন, সাথে সাথে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আচ্ছা! ছোট্ট বাচ্চারাও কী বাইআত হয়?' আব্বাজান বললেন, হ্যাঁ, বাইআত হতে পারে। তারপর আমি পীরানি সাহেবা (হযরত থানবী-পত্নী)-এর কাছে গিয়ে আরজ করলাম, আমি হযরতের কাছে বাইআত হতে চাই। পীরানি সাহেবা হযরতকে বললেন, এই বাচ্চা বাইআত হতে আগ্রহী। হযরত আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইআতকে পুতুলখেলা মনে করবে না তো?'

আমি 'না' সূচক জবাব দিলাম। হযরত থানবী রহ. একটি কাপড়ের একপ্রান্ত আমার হাতে দিয়ে অন্য প্রান্ত নিজের হাতে রাখলেন। এভাবে আমাকে তিনি বাইআত করে নিলেন।"

এভাবেই আমার এই বোন হযরত থানবীর হাতে শৈশবকালে বাইআতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

'পুনশ্চ: এখানে একটি বিষয় সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, বাইআতের আসল মাকসাদ তো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই হাসিল হয়, কিন্তু সিলসিলায় দাখিল হওয়ার বরকত বাল্যকালেও হাসিল করা যায়।'

আমার এই বোনের বিবাহ আমার জন্মের আগেই হয়েছিলো। বরং আমার দুনিয়ায় আসার আগে তাঁর একটি কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিলো। তাঁর দ্বিতীয় কন্যা আমার প্রায় সমবয়সী। তিনি স্বামী-সন্তানসহ আমাদের বাসা থেকে পশ্চিম দিকে ভিন্ন আরেকটি বাসায় থাকতেন। মুহতারামা নাঈমা খাতুন সাহেবার দুই মেয়ে এক ছেলে এবং মুহতারামা আতিকা খাতুন সাহেবার এক মেয়ে, যদিও সম্পর্কে আমাকে মামা বলার কথা, কিন্তু আমার এই ভাগ্নে-ভাগ্নিরা বয়সে আমার বড় ছিলেন এবং ফুফু উম্মাতুল হান্নান সাহেবার (যার আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ) মক্তবে পড়াশোনায় এই চারজন আমার সিনিয়র ছিলেন। বয়সের ব্যবধান অতো বেশি না হওয়ায় আমাদের মধ্যে মামা-ভাগ্নে-ভাগ্নি সম্পর্কের চেয়ে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কটাই ছিলো বেশি এবং আমার বন্ধুত্বের পরিধি তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলো। এদের মধ্যে ভাগ্নে ছিলো শুধু একজন। পরবর্তীকালে যাকে মাওলানা হাকিম মুশাররফ হুসাইন সাহেব বলতাম। আমার বন্ধুত্ব তাঁর সাথেই বেশি ছিলো। তিনি সব ধরনের খেলাধুলোয় পারঙ্গম ছিলেন। আমি শুধু তাকে সঙ্গ দিতাম।

এই দুই বোনের (মুহতারামা নাঈমা ও আতিকা) সাথে আমার বয়সের তফাৎ বেশি হওয়ায়, সংকোচহীন সম্পর্কের পরিবর্তে একরকম মুরুব্বিয়ানা বন্ধন ছিলো।

আমার বড় দুই বোনের পর তৃতীয় নম্বরে ছিলেন, জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী সাহেব রহ.। ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবার বড়। তাঁকে আমরা ভাইজান বলে ডাকতাম। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুতাওয়াস্যিতাহ (মাধ্যমিক স্তর) পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। দুঃখজনকভাবে পরবর্তীতে বেশকিছু জটিলতা তাঁর ধারাবাহিক পড়াশোনা ব্যাহত করে দিয়েছিল। এরপর তিনি আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-প্রতিষ্ঠিত কুতুবখানা, দারুল ইশা'আতের দেখ্ভালের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তবে তাঁর মুতালা'আ (ব্যক্তিগত অধ্যয়ন) বিশেষত ইতিহাস, সীরাত, তাসাওউফ এবং আকাবিরে দেওবন্দের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁদের মালফুযাতের উপর এত বেশি ছিলো যে, সময়ের প্রথিতযশা উলামায়ে কেরামও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। এছাড়াও তিনি হযরত থানবী রহ.-এর হাতে বাইআত ছিলেন এবং বুযুর্গদের চোখের মধ্যমণি ছিলেন। হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান রহ., হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলভী রহ., হযরত মাওলানা দাউদ গজনবী রহ., হযরত মাওলানা রসূল খান রহ.-সহ সবাই তাঁকে যারপরনাই মুহাব্বত করতেন। যখনি তাঁরা আনারকলিস্থ তাঁর দোকানের পাশ দিয়ে যেতেন, অবশ্যই কিছু সময় দোকানে বসতেন, তাঁদের ফয়য ও বরকতে ভাইজানকে সিক্ত করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ভাইজানের অত্যন্ত আগ্রহ ছিলো। রমাযানে দশ/পনেরো খতম তো অনায়াসেই দিতেন। তিনি বড় মাপের কবিও ছিলেন। তাঁর 'কাইফিয়াত' নামক কাব্যগ্রন্থ ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। বইয়ের শুরুতে আমি একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলাম।

ভাইজান হযরত শাইখুল হিন্দ রহ.-এর শাগরেদ, দেওবন্দ ঈদগাহের বংশানুক্রমিক খতীব, হযরত মাওলানা মুবিন (খতীব সাহেব) রহ.-এর কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তখন আমার বয়স ছিলো তিন বছর। আমার এটাও স্পষ্ট মনে আছে, ভাইজানের বিয়ে উপলক্ষে আব্বাজান রহ. আমাদের ঘরের উত্তর পাশে তাঁর জন্য আরো দু'টি কামরা বাড়িয়েছিলেন। তিনি তখন আব্বাজানের মাকতাবা দারুল ইশা'আতের ব্যবস্থাপক ছিলেন। ভাইজান বয়সে আমার চেয়ে অন্তত চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন, তাই বড় দু'বোনের মতো তাকেও আমি বেশ ভয় পেতাম।

ভাইজান জনাব মুহাম্মদ যাকী কাইফী রহ.-এর আর্টের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিলো। কখনো বড় আর্টপেপারে, কখনো টুকরো কাগজে দৃষ্টিনন্দন হস্তাক্ষরে কবিতার পঙ্ক্তি কিংবা শিক্ষণীয় উক্তি লিখে তিনি শখ মেটাতেন।

একবারের ঘটনা–

ভাইজান আঁকাআঁকির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কাজের ফাঁকে কোনও প্রয়োজনে তিনি কোথাও গেলেন। আচমকা আমি সেখানে হাজির হয়ে ভাইজানের লেখার উপর আমার অপটু হাত বুলিয়ে তা নকল করার কসরতে লেগে গেলাম। অমনি পুরো লেখাটা বিকৃত হয়ে গেলো এবং কালি বেয়ে বেয়ে নীচ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লো। 'ভাইজানভীতি' তো আগে থেকেই মনের মধ্যে বদ্ধমূল ছিলো। তবে ওটা ছিলো শুধুই অকারণ-ভয়; কখনোই ভাইজানের আমার গায়ে হাত তোলার মতো উপলক্ষ আসেনি। কিন্তু আজকের এই 'কম্মের' পর আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, এবার আর রক্ষে নেই এবং এতদিন যে ভয় মনে মনে পুষছিলাম, আজ তা বাস্তবেও উপলব্ধি করতে হবে। তবে এটা অনুমান করতে পারছিলাম না যে, এই বাস্তবতার প্রখরতা কতোটা প্রকট হতে পারে। ব্যাপারটা জানার জন্য আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, যেন আগেভাগেই সেটা সহ্য করার মতো মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে পারি। সুতরাং তুলি-কালি ফেলে আমি অন্যান্য ভাই-বোনের কাছে ছুটে গেলাম। একে একে সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম– 'আচ্ছা! ভাইজানের হাতের জোর কেমন? অর্থাৎ তিনি যখন থাপ্পড় মারেন, কতোটা জোরে মারেন?' আমার ভাইবোন, যাদের আমার কৃতকর্মের কথা জানা ছিলো না, সবাই থ' বনে গেলেন! কেউই বুঝতে পারছিলেন না, ভাইজানের থাপ্পড় নিয়ে হঠাৎ আমার এতো গবেষণার প্রয়োজন হলো কেন? পরে যখন তাঁদেরকে আমার কাণ্ডকারখানার কথা শোনালাম, সবাই তো হেসে খুন! এমনকি ভাইজানও যখন অবগত হলেন, আমার এই তদন্তের কার্যত জবাব না দিয়ে অর্থাৎ আমাকে না মেরে এটাকে বরং মজার উপলক্ষ বানিয়ে নিলেন। তারপর থেকে আমার একথাটি একটি কৌতুক বনে গেলো এবং আমার প্রতিভা ও মেধার প্রখরতার অন্যান্য ঘটনাবলীর সঙ্গে এটিও পারিবারিক বিভিন্ন মজলিসের 'কাহানী' হয়ে উঠলো।

পরবর্তীতে তো ভাইজান আমাকে এতটাই কাছে টেনে নিয়েছেন যে, অজান্তেই তিনি আমার বন্ধু বনে গেলেন। কখনো ঠাট্টাচ্ছলে তাঁর সঙ্গে এমন কিছু বলে-কয়ে ফেলতাম যে, আমি নিজেই এ ভেবে লজ্জা পেতাম, বড়ভাইয়ের সঙ্গে সীমালঙ্ঘন তো হয়ে যায়নি! এই সংকোচহীনতার ফলে যখনি আমি তাঁর সঙ্গে মিলতাম, আমার কাছে তাঁকে এক বড়সড় নেয়ামত মনে হতো। তিনি দারুল উলূমে (করাচি) আমাদের কাজের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। অহর্নিশ তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করতেন। যখন থেকে আমি লেখালেখিতে হাত দেই, তিনি আমার লেখাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়তেন এবং কখনো নিজের মতামতও পেশ করতেন, নিয়মিত আমাকে মশওয়ারা দিতেন।

'হযরত মুয়াবিয়া রাযি. আওর তারীখী হাকায়েক' নামক কিতাবটি আমি তাঁরই নির্দেশে লিখেছিলাম, যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে আসবে। ভাইজানের ইন্তেকালের পর আমি তাঁর জীবনবৃত্তান্ত 'আল-বালাগ'-এ সবিস্তর আলোচনা করেছি। এখন সেটা আমার লেখা 'নুকুশে রফতেগা'য় প্রকাশ পেয়েছে।

চলবে ইনশাআল্লাহ...

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বারিধারা মাদরাসায় প্রদত্ত

হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ.-এর বয়ান

বয়ানলেখক : প্রফেসর শেখ আবুল ক্বাসিম

পটভূমি

হযরতজী মাওলানা ইলয়াস রহ.-এর হুকুমে যামানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীনের দাঈ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. চল্লিশ বছরের অধিককাল মদীনা মুনাওয়ারায় তাবলীগের আমীর হিসেবে যিম্মাদারী পালন করেছেন। তিনি বর্ণনাতীত কুরবানীর সাথে মেহনত করে গোটা বিশ্বকে দাওয়াতের মেহনতের ময়দান বানিয়েছেন। অতঃপর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবরস্থান মদীনা মুনাওয়ারার জান্নাতুল বাক্বীতে আপন কবর রচনা করেছেন।

জান্নাতুল বাক্বীর মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করে বরাবর শেষ মাথায় পৌঁছার আট কবর আগে, তিন কবর বামে দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দাঈ ইলাল্লাহ বিশ্রামে রয়েছেন।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে টঙ্গীতে পুরানাদের জোড় উপলক্ষে আগমন করে তিনি তিন দিনে চারটি মাদরাসা যিয়ারতে যান। তিনি প্রতিটি মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে বিনয়াবনত হয়ে মুযাকারার সুরতে আসাতিযায়ে কিরাম ও তালিবুল ইলমদের উদ্দেশে অত্যন্ত জরুরী বয়ান পেশ করেন।

২৪ আগস্ট ১৯৮৯ বৃহস্পতিবার, মাদরাসা যিয়ারতের দ্বিতীয় দিনে তিনি ফরিদাবাদ মাদরাসা যিয়ারতে যান। এ যিয়ারতের বৃত্তান্ত দ্বিমাসিক রাবেতার রজব-শা'বান ১৪৩৯ / মার্চ-এপ্রিল ২০১৮ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিলে এখন ২২/০৮/১৯৮৯ মঙ্গলবার, মাদরাসা যিয়ারতের প্রথম দিনে যিয়ারতকৃত দু'টি মাদরাসার একটির বৃত্তান্ত ও বয়ান পেশ করার চেষ্টা করব।

# # #

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের পুরানাদের ১০ দিনের জোড়ের মাঝের চার দিনের খুরুজে সাথীদের জামাতবন্দী করে বিভিন্ন রোখে প্রেরণ করা শেষ হলে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. ২২ আগস্ট, মঙ্গলবার সকালে নাস্তার পর টঙ্গী হতে রওয়ানা হন। সাথে ছিলেন কাকরাইলের শীর্ষস্থানীয় মুরুব্বী ইঞ্জিনিয়ার হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ., মাওলানা আলী আকবর সাহেব রহ. ও মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব দা.বা.সহ আরো কতিপয় মুরুব্বী এবং হাজী আব্দুল মুকীত সাহেব রহ.-এর নির্দেশে লেখক হিসেবে ছিলাম আমি শেখ আবুল ক্বাসিম। হযরত প্রথমে তাশরীফ নিলেন শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা নূর হোসাইন কাসেমী সাহেব দা.বা.-এর বারিধারা মাদরাসায়।

মাদরাসায় পৌঁছে মুহতামিম সাহেব দা.বা.-এর কামরায় কুশল বিনিময় ও মেহমানদারীর পর মুহতামিম সাহেবের সঙ্গে তার নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়।

মাও. সাঈদ খান সাহেব : ছাত্রসংখ্যা কত?

মাও. নূর হুসাইন কাসেমী (মুহতামিম) সাহেব : গত বছর ছিল একশত। এ বছর আছে একশত ত্রিশ। উস্তাদগণ ২/৩ জন ছাড়া সকলেই মা-শা-আল্লাহ দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফারেগ। ইনিও দেওবন্দের ফারেগ (একজনের প্রতি ইঙ্গিত করে)।

মা. সা. খান সাহেব : ইনি কবে ফারেগ হয়েছেন?

মাও. নূর হুসাইন কাসেমী : তিন বছর আগে।

মা. সা. খান সাহেব : আমিও সেখান হতে ফারেগ হয়েছি।

তারপর মাওলানা সাঈদ খান সাহেব রহ. বললেন, ইলম আল্লাহ পাকের খাস সিফাত। হযরতজী ইলয়াস রহ. বলতেন, 'যিকির বেগায়রে ইলম গোমরাহী, আর ইলম বেগায়রে যিকির ফিতনা।' আজ ইলম ও যিকিরওয়ালার মধ্যে কতো বড় মুকাবিলা! যিকির, ইলম ও দাওয়াত এ তিনটি একত্র হলে উম্মত জুড়বে। আলাদা আলাদা হলে উম্মত টুটবে। এখন শুধু আলফাযের লড়াই চলছে। একেবারে হাকীকী লড়াই। ও লড়াই করছে, এ-ও লড়াই করছে। যে আলফাযের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. খামুশ ছিলেন, তা-ই নিয়ে আজ ইখতিলাফ করা হচ্ছে। হযরতজী ইলয়াস রহ. বলতেন, আমি মেহনত করে করে দীনের প্রতিটি জিনিস সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর তরীকার উপর আনতে চাই; নামায, ইলম, যিকির– সব কিছুকে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আমভাবে 'জুযইয়াত' (আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) নিয়ে বহস করেননি, তাঁরা 'কুল' (মৌলিক বিষয়াদি) নিয়ে চলতেন।

উদাহরণত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হজ্জের সফরে মিনায় নামায কসর করে দুই রাকআত পড়ার ব্যাপারে জোরালো যুক্তি খাড়া করেছেন ঠিক, কিন্তু নামাযের সময় হলে হযরত উসমান রাযি.-এর আনুগত্য করে স্বয়ং চার রাকআত পড়েছেন।

আজ উম্মতের মধ্যে জোড়ার জয্বা নেই। দাওয়াতের যারিয়ায় উম্মতকে জুড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা হযরতজী ইলয়াস রহ.-এর মধ্যে এত হিকমত দান করেছেন যে, আমি আজ পর্যন্ত কারো মধ্যে দেখিনি। তিনি এক বছরের মধ্যে (তৎকালীন উপমহাদেশের প্রধান মুফতী) মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব রহ.-কে দিয়ে ইজতিমায় বয়ান করিয়ে নেন। ইলয়াস রহ. ইলমী বহসে যেতেন, কিন্তু কাজ নিতেন হুসনে তাদবীর দ্বারা। আসল মাকসাদ হল দীন। এটা বহসের জিনিস নয়। ঈমান ও আমলের মধ্যেই আমাদের প্রকৃত কামিয়াবী নিহিত। এটা আসবে কীভাবে? আসবে ইলম ও যিকির দ্বারা। কিন্তু দাওয়াত না চললে– না ইলম বাকী থাকবে, আর না যিকির বাকী থাকবে। দাওয়াতই ইলম ও যিকিরের প্রসার ঘটাবে।

হযরত নূহ আ.-এর সময় যখন দাওয়াত চলেছে, হক উপরে উঠেছে। নূহ আ. চলে গেলেন, দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর ইন্তিকালের সময় সবাই আহলে হক ছিল। কিন্তু হুদ আ. এসে দেখলেন, বাতিলের সয়লাব ঘটে গেছে। তিনি দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন, হক গালেব হল। অতঃপর তিনি চলে গেলেন, দাওয়াতও বন্ধ হয়ে গেল, হকও নীচে নেমে আসল।

কুরআনের সমস্ত ঘটনাবলী থেকে এটাই দেখা যায় যে, দাওয়াত চললে হক গালেব হয়। আজ এর উপর আমল নেই বললেই চলে। যতটুকু আছে, তারই বা কতটুকু সহীহ?

ফলের জন্য গাছ জরুরী, আর গাছের জন্য যমীন জরুরী। অনুরূপভাবে আসল মাকসাদ হল আল্লাহ তা'আলার রেযা ও সন্তুষ্টি। রেযা মিলবে আমল দ্বারা। আমল

কায়েম হলে মাদারেস কায়েম হবে। আল্লাহ তা'আলা এ সকল হাযারাতকে তরক্কী দান করুন এবং তাঁদের তামাম মাসাইল হল্ল (সমস্যাবলীর সমাধান) করে দিন।

অতঃপর তিনি মাদরাসার জন্য আবেগভরে দু'আ করার পর বলেন, মুফতী মাহমুদ সাহেব আমার উস্তাদ। আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী সাহেব বললেন, আমারও উস্তাদ। তারপর মাওলানা সাঈদ খান সাহেব রহ. বলেন, মুফতী মাহমূদ সাহেব রহ.-কে বেশি (৬০ রুপি) বেতনের কথা বলে (দারুল উলূম ছেড়ে অন্য) কোন মাদরাসার খেদমতের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'এখানে এ বেতনেই ভাল আছি।' জ্বী হাঁ, এখন তো বেতন বাড়াবার ফিকির। আর তখন বেতন বাড়ানোর প্রস্তাবেও তাঁরা নাখোশ হতেন। তখন ইখলাস মুকাম্মাল ছিল।

বস্তুত সহীহ ইলম সেটাই যার দ্বারা তাওয়াযু (নম্রতা) আসে, তাকওয়া আসে, সিদক আসে, যুহদ ও কানা'আত আসে।

হযরতজী ইলয়াস রহ.-কে কেউ বলল, হযরত গাড়ি কিনে দেই? তিনি জবাব দিলেন, ভাই! গাড়িওয়ালাদেরকে তাবলীগে লাগাও, তো সব গাড়িই তোমার। (অতঃপর হাজী আব্দুল মুকীত সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,) এই যে এঁর গাড়ি, এটা তো আমারই বটে! করাচীতে গাড়ি লাইন দেয়, আমেরিকায় গাড়িওয়ালারা লাইন দেয়। ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সেও একই অবস্থা।

(অতঃপর তিনি সবাইকে নিয়ে বারিধারা মাদরাসা-মসজিদে তাশরীফ রাখেন ও তালাবাদের মজমায় বয়ান করেন।)

বয়ানের অংশবিশেষ এই–

খুৎবায়ে মাসনূনার পর তিনি কতিপয় আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করে নিম্নোক্ত হাদীস দু'টি পাঠ করেন–

عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ مَا لَمْ تَظْهَرْ فِيكُمْ سَكْرَتَانِ، سَكْرَةَ الْجَهْلِ، وَسَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ، وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الْقَائِلُونَ يَوْمَئِذٍ بِالْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَار

(তরজমা :) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে দু'টি মোহ দেখা দিবে; অজ্ঞতার মোহ ও আরামপ্রিয়তার মোহ। (এক সময় পর্যন্ত তো) তোমরা সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবে। অতঃপর একপর্যায়ে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ার মোহ দেখা দিবে; ফলে তোমরা সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছেড়ে দিবে। সে সংকটময় মুহূর্তে যারা কুরআন-সুন্নাহর কথা বলবে, তারা প্রথম সারির অগ্রগামী মুহাজির-আনসার সাহাবীগণের ন্যায় মর্যাদা লাভ করবেন। (মুসনাদে বাযযার : হা. নং ২৬৩১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا طَغَى نِسَاؤُكُمْ، وَفَسَقَ فِتْيَانُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا تَرَكْتُمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَكَائِنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَشَدُّ مِنْهُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا، وَالْمَعْرُوفَ مُنْكَرًا؟

(তরজমা :) হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে লোকসকল! তোমাদের কী পরিণতি হবে যখন তোমাদের স্ত্রীগণ অবাধ্য হয়ে যাবে আর কন্যাগণ নাফরমানী করবে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এমনও কি হবে?! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, বরং এর চেয়ে আরো ভয়াবহ ব্যাপার ঘটবে; তোমাদের কী পরিণতি হবে যখন তোমরা সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করা ছেড়ে দিবে? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমনও কি হবে?! নবীজী বললেন, বরং এরচে' ভয়াবহও হবে; তোমাদের কী পরিণতি হবে যখন তোমরা অন্যায়কে ন্যায় আর ন্যায়কে অন্যায় জ্ঞান করবে? (মুসনাদে আবী ইয়া'লা: হা. নং ৬৪২০)

তারপর সাঈদ আহমাদ খান সাহেব রহ. বলেন, মেরে বুযুর্গ, আওর মেরে ভাইয়ো! আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় এক প্রকার ইলমই নাযিল করেন। সেটা হল ইলমে ইলাহী। সাইন্স, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসায় ও কৃষিবিদ্যা– এগুলো হল তাজরেবা-অভিজ্ঞতা। এগুলো আসমান থেকে নাযিল হয়নি। এজন্যই কোন ডাক্তার নিজের নামের সাথে 'আলেম' লিখে না; না কিতাবে, না ঘরে, না দপ্তরে। আলেম তো সে, যার কাছে ইলমে ইলাহী আছে। কেউ অল্প ইলম হাসিল করলেও সবাই তাকে বলে, 'মৌলভী সাব'। কিন্তু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারকে উলামা বলা হয় না। কারণ, সবাই জানে যে, তাদের বিদ্যা 'ইলম' নয়। এটা তাজরেবা, অভিজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু আকল-বুদ্ধি দান করেছেন। মানুষ সেই আকল-বুদ্ধি খাটিয়ে যমীনের অভ্যন্তরীণ খোদাদাদ বস্তু ও খনিজ বের করে তার একটা শেকেল দেয়, আকৃতি দেয়।

আকল থাকে দিলের মধ্যে। দিল হল বাদশাহ। দিল হল মারকায। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের দিলের মধ্যে আকল সৃষ্টি করে দেন। অতঃপর দেমাগ সেটা দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।

এর উদাহরণ হল বিজলী (বিদ্যুৎ)। এটা পয়দা হয় পাওয়ার হাউসে, আর ব্যবহৃত হয় পাখায়, বাতিতে। তেমনি আকল পয়দা হয় দিলে, জাহের হয় দেমাগে। অতঃপর দেমাগ শেকেল দেয়। তো 'দিল' হল বাদশাহ, দেমাগ হল উজির। দিল বলবে– বাদশাহ হবো, হাফেয হবো, আলেম হবো, ফকীহ হবো, ডাক্তার হবো। তখন দেমাগ তার শেকেল বলে দেয়, পদ্ধতি বাতলে দেয়।

যা হোক বলছিলাম, ইলম একটাই, যেটা আসমান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নাযিল হয়েছে। এই আসমানী ইলমই কামেল মুকাম্মাল। এ ইলমই ফায়সালাকারী। হক ও বাতিল, সহীহ ও গলদ সব কিছু এ ইলমই বলে দিবে। সে আরও বলে দিবে, আল্লাহ কিসে রাজি-খুশি এবং কিসে নারাজ। এ কথা সাইন্স বলবে না, ডাক্তারও বলবে না। বিজ্ঞানীরা, ডাক্তাররা কামিয়াবী কোন পথে, জান্নাতে যাওয়ার পথ কি, জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কি– বলতে পারে না।

সাইন্স তো শুধু বস্তুসমূহের বাহ্যিক ফায়দা বলে দেয়। যেমন, লোহা, প্লাস্টিক, বাতাস, সূর্য ও চাঁদের আলো থেকে এই এই ফায়দা হয়। কিন্তু সে বলতে পারে না, কামিয়াবী (সফলতা) কোথায়।

এ ইলমই বাতলে দিবে, আল্লাহর রেযামন্দী ও ইন'আম কিসে আসবে এবং কোন কাজের পরিণতিতে আযাব রয়েছে।

এ ইলম তামাম আলমকে (গোটা বিশ্বকে) আলেমের জন্য মুসাখ্খার করে দেয়, তার অনুগামী করে দেয়; ফেরেশতাকে মুসাখ্খার করে দেয়। মাছকে মুসাখ্খার করে দেয়। অনুরূপ চাঁদ-সুরুয, পরিন্দা-চড়িন্দা, বাদল-হাওয়া সবকিছুকে

মুসাখ্খার করে দেয়। এ ইলম কখনও বাদল (মেঘমালাকে) হাঁকিয়ে আনবে, কখনও থামিয়ে দিবে। কখনও বাতাসকে টেনে আনবে, কখনও তেজ হাওয়াকে রুখে দিবে। এ ইলমের তাকত ও শক্তিকে মামুলী মনে না করি। তামাম দুনিয়ার তাকত ও শক্তি এ ইলমের কাছে কিছু নয়। এ ইলম যা করতে পারে এবং করে দেখায়, কোন কিছু তা করে দেখাতে পারে না।

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (আপনার পলক ফেরানোর পূর্বেই আমি আপনার সামনে তা হাজির করব। (সূরা নাম্‌ল- ৪০)

এ ইলম বিলকিসের সিংহাসন (আল-আরশুল আযীম) চোখের পলকে হাজারো মাইল দূর থেকে নিয়ে আসে। এটা কি সাইন্স পারবে? কস্মিনকালেও না। সুতরাং এ ইলমের জওহর লক্ষ্য কর, এর শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি কর।

আজ আমরা এ ইলমের তাকত জানি না। আজ আমরা বাচ্চার মত উপলব্ধিহীনভাবে ইলম হাসিল করছি। বাচ্চাকে যদি বলি, তোমার ইলমের বরকতে আসমান থেকে মান্না-সালওয়া নামবে– সে বলবে, মা রুটি না দিলে কিভাবে হবে? ৫/৬ বছরের বাচ্চাকে বলো, এ ইলম হাসিল করতে যাও, তুমি সারা দুনিয়ার খলীফা হবে, সারা বিশ্ব তোমার অনুগত হয়ে যাবে। সে কি এই কথায় মাদরাসায় যাবে? যাবে না, সে তো আমাদের এই কথা বুঝবেই না।

অনুরূপ যদি বলা হয়, না গেলে বাদশাহ অ্যাটম বোম মারবে। তবুও সে যাবে না। কেন? কারণ সে অ্যাটম বোম বুঝবে না। কিন্তু যদি বলা হয়, না গেলে গালে থাপ্পড় দেব তাহলে যাবে। কারণ সে বাপের থাপ্পড়ের মর্ম জানে, যদিও বাদশাহর অ্যাটম বোম জানে না।

মেরে মুহতারাম বুযুর্গ! আমরাও এই অবুঝ বাচ্চার মত ইলম হাসিল করছি; কিন্তু আল্লাহর কুদরত ও সুন্নাতের শক্তি জানি না। যদি বলা হয়, মাদরাসায় যাও ৫০০ টাকা দেয়া হবে– বলবে, বুঝেছি। যদি বলা হয়, মাদরাসার যাও আল্লাহকে নিতে, তাকে নিজের করে নিতে– বলবে, বুঝি না। বস্তুত আল্লাহ্ আমার হলে সবকিছুই আমার হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, হে বালক! যদি তুমি আল্লাহর দীনের (হুকুম আহকামের) হেফাযত কর, আল্লাহ তোমার হেফাযত করবেন। দীনের হেফাযত করলে তুমি আল্লাহকে সামনে পাবে। যা চাও তা-ই পাবে, কোন মুসীবতে পড়ে মদদ চাইলে মদদ পাবে। এই একীন দিলে বসাও। সমস্ত মাখলুক তোমাকে নাফা' দিতে চাইলে পারবে না। তা-ই হবে যা মোকাদ্দার। সমস্ত মাখলুক তোমার লোকসান করতে চাইলে পারবে না। হবে তা-ই, যা তাকদীরে লেখা রয়েছে। কলম উঠে গেছে আর কালি শুকিয়ে গেছে। তাকদীর পাল্টাবে না।

মুসীবত এসে গেলে সবর কর, মুসীবত দূর হয়ে যাবে।

যে মুসীবত এসেই পড়েছে, বলো না, এটা তদবীরের কমতির কারণে। বরং এটাই তোমার তাকদীরে ছিল। আর যে মুসীবত আসেনি, বলো না, তদবীরের জোরে বেঁচে গেছি। বরং এটা আসারই ছিল না।

এ ইলম হল, ঈমানের এবতেদা (শুরু)। আগে এ ঈমান পয়দা করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বলতেন,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيْمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْمَانًا

(তরজমা :) আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখেছি, পরে কুরআন শিখেছি, এতে আমাদের ঈমান মজবুত হয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৬১)

অর্থাৎ, আমরা আগে ঈমান শিখেছি, পরে কুরআন শিখেছি।

সাহাবায়ে কেরাম ঈমান কীভাবে শিখেছেন? আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে সীমাহীন মেহনত-মুজাহাদা এবং দাওয়াত ও জিহাদের দ্বারা।

হযরত আবূ উবাইদা রাযি. ৩০০ জনের লশ্কর নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় চলছেন। দৈনিক একটি করে খেজুর খান। খেজুর শেষ হয়ে গেলে নিরূপায় হয়ে গাছের পাতা খান। সাথীরা আমীর সাহেবকে একথা বলেননি যে, খানা নাই, কেমনে চলব, খানার ব্যবস্থা করেন। তারা আল্লাহর উপর ভরসা করেই চলতে থাকেন। তারপর কী হল? আল্লাহ তাঁদের জন্য এক বিরাটকায় মাছ পাঠালেন। বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত মোতাবেক ১৮ দিন, আর বাইহাকী শরীফের রেওয়ায়েত মোতাবেক ৩০ দিন ধরে ৩০০ জনের এ জামাআত এ মাছ থেকে খেতে থাকেন।

মাছের চোখের ভেতরে ঢুকে তেল বের করে আনেন তেরো জনে। মাছের মাঝখানের কাঁটাটা দাঁড় করানো হলে কাফেলার সবচে' দীর্ঘকায় ব্যক্তি সবচে' উঁচু উটের পিঠে বসা অবস্থায় তার ভেতর দিয়ে পার হয়ে যান। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৯৮৩; দালাইলুন নবুওয়াহ লিল-বাইহাকী ৪/৪০৮)।

এই ঘটনা থেকে সাহাবায়ে কেরাম ঈমান শিখলেন। তারা শিখলেন যে, যখন আল্লাহর হুকুম মানা হবে, আল্লাহ মাননেওয়ালাকে গায়েব থেকে পালবেন।

অতএব, আমরা এ ইলম মুশাহাদাকে সামনে রেখে হাসিল না করি, দুনিয়াকে সামনে রেখে হাসিল না করি। বরং আখেরাতকে সামনে রেখে হাসিল করি। অন্যথায় দুই রুটিও মেলা মুশকিল।

আখেরাতকে সামনে রেখে ইলম হাসিল করলে রুটি-রুযি গায়েব থেকে আসবে। আখেরাতকে সামনে রেখে ইলম হাসিল করলে তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল আসবে এবং মাসআলা (সমস্যাবলী) গায়েব থেকে হল্ল (সমাধান) হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াকে সামনে রেখে এ ইলম হাসিল করলে পেরেশানী আসবে। আজ সবার সামনে দুনিয়া। এজন্য সবাই পেরেশান। সরকারও পেরেশান, জনগণও পেরেশান। মোটকথা এই ইলম হাসিল করতে আখেরাতের দিকে রোখ করা দরকার। তালেবে ইলম কাউকে বলবে না যে, আমার রুটি-রুযির ব্যবস্থা করেন।

এ ব্যাপারে ঘটনা আছে–

এক তালিবে ইলম দূর থেকে এসেছে।

উস্তাদ : কোত্থেকে এসেছো, কেন এসেছো?

তালিবে ইলম : পড়তে এসেছি, বহু দূর থেকে।

উস্তাদ : খানার ব্যবস্থা কী হবে?

তালিবে ইলম : আপনার কাছে খানা নিতে আসিনি। যার ইলম হাসিল করতে এসেছি, খানা তিনিই দিবেন।

তালিবে ইলমের এমন হিম্মত দেখে উস্তাদ তাকে ভর্তি করে নিলেন। এদিকে ঐ গ্রামে নিয়ম ছিল, কেউ মারা গেলে কোন তালিবে ইলমকে ৪০ দিন খানা খাওয়াতে হবে। তো তালিবে ইলমটি ভর্তি হওয়ার পরপরই গ্রামের একব্যক্তি মারা গেল। মরহুমের আত্মীয়-স্বজন এসে উস্তাদের কাছে একজন তালিবে ইলমের সন্ধান করলে উস্তাদ ঐ তালিবে ইলমকে দেখিয়ে দিলেন। ব্যস, ৪০ দিনের খানার ব্যবস্থা হয়ে হল। ৪০ দিন শেষ হতেই আরও একজন মারা গেল। এবারও ৪০ দিনের খানার ব্যবস্থা হল। পরে কেউ বলল, তোমরা তাড়াতাড়ি এই তালিবে ইলমের খানার ব্যবস্থা কর, নয়তো মানুষ মরে মরে মহল্লা খালি হয়ে যাবে!

হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ ও তার সাথীদের ঘটনা। তিনজন তালিবে ইলম বের হলেন হাদীস শিখতে। মদীনা মুনাওয়ারায় হাদীস শিখে তারা খবর পেলেন, মিশরের রাজধানী কায়রোতে

একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস আছেন। সিদ্ধান্ত হল, এবার তাঁরা কায়রো যাবেন। তাঁদের ইলম শেখার তরীকা ছিল, তাঁরা জরুরত পুরা করার জন্য নিজেরাই কামাই করতেন এবং উপার্জিত পয়সা ইলম অর্জনে ব্যয় করতেন। তো তারা যখন কায়রো পৌঁছলেন তখন তাদের টাকা-পয়সা সব শেষ হয়ে গেছে। এখন একজন উপার্জন করতে গেলে অন্যেরা যা শিখবে সেগুলো তার ছুটে যাবে। কাজেই শুরু হল অনাহার। একদিন অনাহারে। ২য় দিন অনাহারে। ৩য় দিন অনাহারে। আখের শরীরও তো দুনিয়ার নেযাম মানে। ধীরে ধীরে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে হাঁটাচলারও শক্তিও প্রায় শেষ। এখন হাঁটতে গেলে পড়ে যান। উঠতে গেলে পারেন না। এবার জান বাঁচানোর মাসআলা। জান বাঁচানোর জন্য তো সওয়াল করা জায়েয। কিন্তু তিনজনের প্রত্যেকেরই সওয়ালের যিল্লত উঠানোর কি প্রয়োজন? সিদ্ধান্ত হল, একজন সওয়াল করলে যেহেতু তিনজনের খানা চলতে পারে, কাজেই সবাই নয়, একজনই সওয়াল করবে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল সেই একজনটা কে?

লটারি করা হলো। নাম উঠল হযরত হাসানের। তিনি বললেন, যাবো কিন্তু রাতে যাবো, যেন কেউ চেহারা না দেখে। ইশার পর দুইজন মসজিদে শোয়া। হযরত হাসানের দিলে আল্লাহ তা'আলা একথা ঢাললেন যে, 'মাখলুকের কাছে না চেয়ে আল্লাহর কাছে চাও।' ব্যস, তিনি আল্লাহর কাছে চাইলেন। নাছোড় বান্দা হয়ে চাইলেন। হঠাৎ মসজিদের দরজা খটখটানোর শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে দেখেন, বাদশাহর উজির। উজির বললেন, বাদশাহ পাঠিয়েছেন; এই যে খানা এবং প্রত্যেকের জন্য চল্লিশ দীনার। জিজ্ঞেস করলেন, বাদশাহ জানলেন কীভাবে? বলুন, নয়তো কবুল করব না। উজির বললেন, বাদশাহ শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ আওয়াজ পেলেন,

عليك حسن ابن زياد قبل ان يموت (হাসান বিন যিয়াদ মারা যাচ্ছে! জলদি খবর নাও!!)

পরপর কয়েকবার একই আওয়াজ আসলে বাদশাহ জানতে চাইলেন, সে কোথায়? বলা হল, অমুক মসজিদে। উযির বললেন, তারপর আমাকে পাঠান হল। আর সকালে বাদশাহ নিজে আসবেন এবং আপনাদের জন্য অযীফা নির্ধারণ করে দিবেন।

এবার তাঁরা পরামর্শ করলেন, ইলম হাসিল করছি আল্লাহর জন্য। বাদশাহ এলে তো আর আল্লাহর জন্য থাকবে না। শোহরত (জানাজানি) হয়ে যাবে। সুতরাং সকাল হওয়ার আগেই অন্য কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। সকালে বাদশাহ এসে তাদেরকে না পেয়ে মহল্লাওয়ালাদের কাছে খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। পরে বাদশাহর আনা অযীফা দিয়ে মিশরের 'জামি'আ আল-আযহার' কায়েম করা হয়। বড় মাপের মুহাদ্দিস, মুত্তাকীগণ এমনই হন। তাদের সামনে বাদশাহরা ঝুঁকে যান। আর আমরা তো ব্যবসায়ীর সামনেই ঝুঁকে পড়ি। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা উযিরদেরকেও আমার সামনে ঝুঁকিয়ে দিবেন, যখন আমি আল্লাহর কাছে নিজেকে ঝুঁকিয়ে দিবো। এ ইলমের সামনে আল্লাহ সবকিছুকে মুসাখ্খার করে দেন।

আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন। আপনাদেরকে সবর, শোকর এবং আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বত দান করুন যেন ইয্যতের যিন্দেগী নসীব হয়, এ ইলমের উসীলায় বুলন্দী নসীব হয়। আমীন।

এ ইলম তার বাহককে কয়েকটি জিনিস শেখাবে।

১। আল্লাহর আহকামাত শেখাবে।

২। আমলের ওপর উঠাবে।

তবে দাওয়াত দিতে দিতে এ ইলম শিখতে হবে। তখন দুনিয়া হাকীর হবে। দিল থেকে দুনিয়ার কীমত বের হবে। আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদেরকে কখন রোম-পারস্য দান করেছেন?

যখন দুনিয়ার কীমত তাদের দিল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

(তরজমা :) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও মনোরম। এবং আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে এখানে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখবেন, তোমরা কী আমল করো। তাই সতর্ক থেকো দুনিয়া এবং নারীজাতি থেকে। কারণ, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের প্রথম কেলেঙ্কারিই ছিল নারীঘটিত। (সহীহে মুসলিম; হা.নং ২৭৪২)

সাহাবা রাযি. দাওয়াত দিতে দিতে ইলম হাসিল করেছেন, যিকির করেছেন, মুআমালাত ও মুআশারাত ঠিক করেছেন। তখন এসব বিষয়াদি তাঁদের জীবনেও এসেছে আর দুনিয়াতেও প্রসার লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করে করে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর মধ্যে ৪টি গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

১. মুতা'আল্লিম, ২. মু'আল্লিম, ৩. মুবাল্লিগ, ৪. মুজাহিদ।

তলবে ইলমের যমানা থেকেই দাওয়াতের জযবা পয়দা করা চাই। সবাইকে আল্লাহ তা'আলা হিম্মত, কুওয়াত ও ইখলাস দান করুন। আমীন।

আল্লাহর খাযানা থেকে ইলম পাওয়ার জন্য ৪টি আদব মেনে চলা দরকার–

১। উস্তাদের আদব

আকীদাত ও ভক্তি। মনে করা যে, আমার উস্তাদ আল্লাহওয়ালা।

এক পীর সাহেব ছিলেন। তার বহু মুরীদ ছিল। একবার এক যুবতী মহিলা তার কামরায় প্রবেশ করল। পীর সাহেবও কামরায় প্রবেশ করে দরজা লাগিয়ে দিলেন। অবস্থা দেখে মুরীদরা সব ভাগল। কিছুক্ষণ পর পীর সাহেব কামরা থেকে বের হয়ে দেখেন ২/৩ জন ছাড়া সব মুরীদ উধাও। পীর সাহেব তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, কি বাপুরা, সবাই চলে গেল, তোমরা কেন যাওনি? তারা বলল, আমরা আপনাকে নবী মানিনি, জিবরীল ফেরেশতাও মানিনি, সাহাবায়ে কেরামের শান কত বড়, তাদের থেকেও তো ভুলচুক হয়েছে; আখের আপনার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেলে কী এমন হয়েছে? তাওবা করে নিবেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মাফ করে দিবেন। [এবার পীর সাহেব বললেন, বেটারা আসল ঘটনা হল, এই মহিলা আমার বিবি; বহুদিন যাবত বাড়িতে না যাওয়ায় সে নিজেই আজ আমার কাছে চলে এসেছে।]

তো উস্তাদের ভুলচুক নজরে এলে কাঁচা তালিবে ইলম সমালোচনা করতে থাকে। আরে ভাই উস্তাদের প্রতি আকীদাত রাখো, মুহাব্বাত রাখো, তার ইতাআত ও খিদমত করো। খিদমত না করলে হবে না।

হযরত থানভী রহ. বর্ণিত ঘটনা। এক তালিবে ইলম আসল ইলম শিখতে। সে উস্তাদের কাছে খেদমত করার আগ্রহ প্রকাশ করল। উস্তাদ অনুমতি দিলেন। তালিবে ইলমটি প্রতিদিন সকালে যমুনা নদী থেকে উস্তাদজীকে এক ঘড়া পানি এনে দিতো। একদিন পথিমধ্যে হযরত খাযির আ. তালিবে ইলমের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তালিবে ইলম বলল, আমার সময় নেই।

হযরত খাযির : জানো! আমি 'খাযির'।

তালিবে ইলম : যে হোন, হোন আমার সময় নেই।

–জানো, মানুষ আমাকে খুঁজে ফিরে!

–যে খুঁজে ফিরে তার কাছেই যান।

–আমাকে দিয়ে দু'আ করাও!
–আমার দরকার নেই।
–আমার দু'আ কবুল হয়, দু'আ করাও!
–ঠিক আছে, দু'আ করে দিন, যে সব খারাবী আমার তাকদীরে লেখা আছে তা যেন দূর হয়ে যায়।
–তা কী করে হয়? ভালো-মন্দ তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়। এতে কোন বান্দার এখতিয়ার নেই।
–তাহলে আর কী দু'আ করবেন? খারাবীই যদি দু'আ করে দূর করতে না পারেন, তাহলে কল্যাণ তো আমার তাকদীরে এমনিতেই লেখা আছে!

এবার হযরত খাযির আ. চিন্তায় পড়ে গেলেন, আর এই সুযোগে তালিবে ইলম পানি আনতে চলে গেল। যা হোক, এসব কথোপকথনে পানি আনতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল। উস্তাদ কারণ জিজ্ঞেস করলে তালিবে ইলম পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিল। উস্তাদ বললেন, তুমি হযরত খাযির আ.-এর মর্তবা জানো না? তালিবে ইলম বলল, জানি, কিন্তু আপনি আমার উস্তাদ, এজন্য আপনার মর্তবা আমার কাছে শতগুণে বেশী। সুতরাং আপনার অনুমতি ছাড়া আমি হযরত খাযিরের খিদমতে কীভাবে সময় দেই? তালিবে ইলমের এই জবাবে উস্তাদের দিল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উস্তাদ দিল খুলে দু'আ দিলেন, আর তালিবে ইলম সাথে সাথে মুহাদ্দিস বনে গেল।

২। মাদরাসার আদব

যে মাদরাসায় বসে ইলম হাসিল করছো, সেখানে বসে সংবাদপত্র না পড়া চাই। সংবাদপত্রে বহু মিথ্যা সংবাদ থাকে, গীবত থাকে। যমীন মিথ্যা খবরের সাক্ষী হবে। সংবাদপত্র না দেখে তুমি দেখবে জান্নাতে কী আছে, কবরে কী আছে...। সংবাদপত্রের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

৩। কিতাবের আদব

দুনিয়ার সব বিদ্যাই খাসারা আর লোকসানের মধ্যে আছে, যদি না সেগুলো ইলমে ওহীর অনুগামী হয়। অন্যান্য বিদ্যাকেও খাসারা থেকে বাঁচানেওয়ালা এ ইলম। সুতরাং এ ইলম যে কিতাবের ওয়াসেতায় অর্থাৎ মাধ্যমে হাসিল হয় তার প্রতি আদব রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী।

৪। সময়ের আদব

যে ওয়াক্তগুলো ইলম হাসিলের জন্য বরাদ্দ, তার দ্বারা দুনিয়াবী কাজ করবে না। বন্ধু আসলে বলতে হবে, এখন সবকের সময়, অপেক্ষা করো। এমনকি দরসের সময় পিতা আসলেও তাকে ইশারায় আদবের সাথে বসিয়ে রাখা। দরস শেষ হলে তারপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

তালিবে ইলমের যিন্দেগীতে যতক্ষণ এ চার জিনিস না আসবে, ততক্ষণ তার মধ্যে ইলমের হাকীকত আসবে না।

(অতঃপর তিনি তালিবে ইলমদেরকে ফারেগ হওয়ার পর সাল, রমাযানে চিল্লা, অন্যান্য বিরতিতে সময় লাগানো, মাসে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে মশওয়ারা, গাশ্‌ত, দৈনিক তা'লীম ও ১০ মিনিটের মেহনত ইত্যাদির তাশকীল করেন।)

তাশকীলের পর দু'আর আগে বলেন, হযরতজী ইলয়াস রহ. বলতেন, যারা পড়তে আসে আগে তাদের বাপ-মা'কে ইলম দাও, তারপর তাদেরকে ইলম শেখাও। অনুরূপভাবে যাদের হাতে বাহ্যিক নেযাম ও ব্যবস্থাপনা রয়েছে তাদেরকেও আগে দীনদারীতে আনা। দাওয়াত দ্বারা তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের করা। তারপর দেখবে কত বরকত। বড় বড় তাজের, বড় বড় সম্পদশালী তোমার সাথে মশওয়ারা করতে আসবে; বিয়ের জন্য, ব্যবসার জন্য। আরেকটা কথা– ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে কখনও ঠাণ্ডা-গরম ও ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে ডর-ভয় করবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে কি গরম ছিল না? ছিল। সাহাবায়ে কেরাম ভুকা-ফাকা থেকে ইলম হাসিল করেছেন। তারপর তাদের কদর হয়েছে। সেই যুগেও গরম ছিল, ঠাণ্ডা ছিল, ক্ষুধা ছিল, কাপড়ের অভাব ছিল। তারা এসব উপেক্ষা করে করে ইলম হাসিল করেছেন। তো আগ্রহের সাথে এগুলো বরদাশত করতে থাকলে তখন দিলের মধ্যে ইলমের আযমত আসবে। আল্লাহর হুকুমের আযমত আসবে। দুনিয়ার আযমত বের হয়ে যাবে।

(বি.দ্র. আয়াত ও হাদীসসমূহের ইবারত, অনুবাদ এবং হাওয়ালা বয়ানলেখকের বড় সাহেবযাদা [ফাযেলে রাহমানিয়া] মুফতী আব্দুল্লাহ বিন ক্বাসিম কর্তৃক সংযোজিত)

মাদরাসাতুর রহমান আল-আরাবিয়া

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মকতব ও নাযেরা বিভাগে আবাসিক ও অনাবাসিক
এবং হিফযুল কুরআন বিভাগে শুধুমাত্র আবাসিক ছাত্রদের ভর্তি চলছে।

ভর্তি শুরু ১লা রমাযান

যোগাযোগ
০১৯৭৭৭৪৮৮৭৭, ০১৯২৪০৮৫৬৭৮

কোটা সীমিত

ঠিকানা : বাড়ি নং-১৭, রোড নং-৪, ব্লক-ই
মুহাম্মাদপুর ফিউচার টাউন লিমিটেড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

যাতায়াত : মুহাম্মাদপুর ভেড়িবাঁধ তিন রাস্তার মোড় থেকে রিক্সাযোগে মুহাম্মাদপুর ফিউচার টাউন লিমিটেড ৪০ ফিট রাস্তায় কালভার্ট পার হয়ে হাতের ডানে দ্বিতীয় গলিতে।

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

মুফতী হাসান সিদ্দীকুর রহমান

ইসলাম একটি কালজয়ী অনবদ্য জীবন বিধান। বিশ্বসৃষ্টির শুরু থেকেই মহীয়ান-গরীয়ান ও সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথের নাম ইসলাম। আদি পিতা হযরত আদম আ. থেকে এর যাত্রা শুরু এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সাধিত হয় এর পূর্ণতা। ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু, যথার্থ ও অত্যন্ত যৌক্তিক সমাধান দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 'নিঃসন্দেহে ইসলামই মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন বা ধর্ম।' (সূরা আলে ইমরান- ১৯)

তাই আমরা দেখতে পাই মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীসহ এমন কোন সমস্যা নেই যার সুষ্ঠু সমাধান ইসলাম দেয়নি।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে মানুষের বসবাস। মানুষে মানুষে কোন শ্রেণী-বিভাগ নেই। সবাই একই উপকরণে একই স্রষ্টার সৃষ্টি। একই পৃথিবীর বাসিন্দা। একই সূর্য আর একই চাঁদের আলো গ্রহণকারী।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় যুগে যুগে মানুষে মানুষে তৈরি হয়েছে বৈষম্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। কালে কালে মানুষের হাতেই মানুষ লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়েছে। এমনই একটি শোষিত ও অধিকার-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হলো, 'শ্রমিক সম্প্রদায়'।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারি, ইসলামের বিপরীতে কোন তন্ত্র-মন্ত্রই শ্রমিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেনি। উপরন্তু তার উপর চালিয়েছে নির্যাতনের স্টিমরোলার।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামের বিপরীতে দু'টি মতবাদ বহুল প্রচলিত। ক্যাপিটালিজম (Capitalism) বা পুঁজিবাদ আর সোশ্যালিজম (Socialism) বা সমাজবাদ।

ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদের মূলমন্ত্রই হলো শ্রমিকশোষণ। শ্রমিক তিলে তিলে গায়ের রক্ত পানি করে, সীমাহীন খাটুনির বিনিময়ে পণ্য উৎপাদন করে দেয়; তার বিনিময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে দেয় সীমাহীন দারিদ্র্য ও অভাব, অমানুষিক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার অবর্ণনীয় মনস্তাপ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগাতার পরিশ্রমের পরও দু'বেলা আহারের অন্ন শ্রমিকে জোটে না। অথচ এ পুঁজিপতিরাই আরাম-প্রাসাদে বসে ভোগ করে শ্রমিকের শোণিত মিশ্রিত শ্রমের ফসল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্ধভক্ত ও অকুণ্ঠ সমর্থক ইরিক্সিল লিখেছেন, 'কারখানায় আমাদের মানুষের আর প্রয়োজন নেই। কেননা যন্ত্রগুলো মানুষ থেকে ভালো কাজ দেয়। যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানবশ্রমের অনেকটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তার ব্যবহার হয় কম। তাই আমাদেরকে যন্ত্র নয় বরং মানুষ খতম করে দিতে হবে। আমরা ঐ সমস্ত লোকদের খতম করে দিতে চাই যারা কারখানায় কাজ করে অর্থাৎ শ্রমিক।' (Money and morals)

বাস্তবিকপক্ষে পুঁজিবাদ মানুষকে এতটাই নিষ্ঠুর করে তোলে যে, হাজারো পণ্যসামগ্রী সে ধ্বংস করে দিলেও লাখো বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার তাদের মনে সামান্যতম প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। এদের একমাত্র শঙ্কা হলো, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হলে মুনাফার হার কমে যাবে। অধিক মুনাফাখোরীর নেশায় তারা লাখো বনী আদমকে ভুখা-নাঙ্গা রেখে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও দ্বিধা করে না।

খোদ পুঁজিবাদেরই একজন অন্ধভক্ত স্যার টাউনসেন্ড নির্বিঘ্ন কণ্ঠে বলেছেন, 'ক্ষুধার কষাঘাত এমনই এক মারাত্মক অস্ত্র, যা অবাধ্য, জংলী পশুগুলোকেও শান্ত-সুবোধ বানিয়ে ফেলে। এরই সাহায্যে অবাধ্য হতে অবাধ্যতর মানুষও বাধ্য হয়ে যায়। তাই তোমরা গরীব শ্রমিকদের থেকে যদি কাজ নিতে চাও তবে এর একমাত্র পন্থা হচ্ছে এদেরকে ভুখা রাখা। ক্ষুধাই এমন এক আশ্চর্য বস্তু, যা গরীব ও সর্বহারাদেরকে যে কোন পরিশ্রমের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।' (Dissertation on the poor laws)

এ নির্মম পুঁজিবাদী বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের কাছে শ্রমিক ও মজদুরদের কোন সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত অধিকার নেই। বরং এই বুর্জোয়াবাদ ও শ্রমিক শোষণবাদের জন্মই হয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিকদের মনে করা হয় একটি উৎপাদন-যন্ত্র। এখানে শ্রমিকরা নিজেদের প্রাণ ও অন্নের তাগিদে এক চিরন্তন দরকষাকষিতে লিপ্ত হয়। সংগ্রাম ও বিক্ষোভই হয় তাদের অধিকার আদায়ের প্রধান পন্থা।

আধুনিক সভ্যতার দাবিদার ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষত আমেরিকা-ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকদের যে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দেখা যায়, তা মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোন কারামতি বা অন্তর্নিহিত গুণের কারণে নয়; বরং এটা তদীয় অঞ্চলের শ্রমিকগোষ্ঠীর বহুযুগ ও বহুকালের সংগ্রাম ও বিক্ষোভেরই ফসল।

নিজেদের সুদ আদায় করতে গিয়ে গরীবের রক্ত পানকারী, শ্রমিকদের শরীরের গোশত ভক্ষণের জঘন্য মনোবৃত্তি লালনকারী পুঁজিবাদের ধ্বজাধারীরা কখনো অন্যের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিপ্রবণ হতে পারে না। তাদের থেকে এ আশা করা দুরাশা বৈ কিছুই নয়; বরং তাদের কাছ থেকে সহানুভূতির প্রত্যাশা মায়াবী মরীচিকা-ভ্রমের নামান্তর।

এদিকে স্যোশালিজম বা সমাজবাদ শ্রমিকদের অধিকার হরণে পুঁজিবাদের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে। সমাজতন্ত্রী লাল-সাম্রাজ্যবাদীরা অসহায় শ্রমিক শ্রেণীকে বৈষম্যহীন সমাজ কায়েমের রঙিন খোয়াব দেখিয়ে এবং নির্মল স্বাচ্ছন্দ্যময় শ্রমিকরাজ্য প্রতিষ্ঠার গালভরা বুলি আওড়িয়ে শ্রমিক সম্প্রদায়কে ভীষণভাবে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করেছে। পুঁজিবাদে শ্রমিক সম্প্রদায়ের যৎসামান্য যে অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল সমাজবাদ সেটাকেও নির্মমভাবে দলে-পিষে, দুমড়ে-মুচড়ে থেঁতলে দিয়েছে। ধীরে ধীরে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জেগে উঠেছে ধূমায়িত অসন্তোষ। সে অসন্তোষের পুঞ্জীভূত বিস্ফোরণে ভেঙ্গে-চূরে খানখান হয়ে গেছে এককালীন সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন। যার জ্বলন্ত প্রমাণ আজকের সমাজতন্ত্রিক পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশ।

ইতালি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া সফর করে মন্তব্য করেছিল, 'আমরা রাশিয়ার কনকনে শীতের মধ্যে নারী শ্রমিকদেরকে ইটের বোঝা বহন করে ষষ্ঠ তলায়ও পৌঁছতে দেখেছি। এসব কাজের জন্য অন্যান্য

দেশে যে সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাদের জন্য সেসব কিছুই ছিল না। ' (সোভিয়েত ওয়ার্ল্ড)

এভাবে সমাজতন্ত্রের রাক্ষুসে স্টিমরোলারে চাপা পড়ে কত শ্রমিক ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়ে তাদের যৎসামান্য সংবাদই প্রচারের আলোয় বেরিয়ে আসে।

দেখুন! প্রাপ্য মজুরী চাইতে গিয়েও একজন শ্রমিককে কিভাবে সমাজতন্ত্রীদের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এক শ্রমিকের ভাষায়, 'আমাকে ধরে আনা হয় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীব্র ভোল্টেজের বাল্বের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। আলোর তীব্রতায় আমার চোখ দু'টো যেন গলে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখের পানি ফেললে লাথি-ঘুষি বর্ষণ করে আমাকে তার প্রতিদান দেয়া হতো। আর এভাবে টানা ৭২টি ঘণ্টা আমার উপর দিয়ে কেটে যায়!!' তিনি আরো বলেন, 'অনেক সময় আমাকে লবণাক্ত খাদ্য পরিবেশন করা হতো এবং লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত রাখা হতো। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলেও একফোঁটা পানি দেয়া হতো না। শুধু তাই নয়, এরপর হাত পা বেঁধে উল্টো করে ৪০ ঘণ্টা লটকে রাখা হয়। শরীরের পশমগুলো একটা একটা করে এমন নিষ্ঠুরভাবে টেনে উঠানো হতো, যাতে চামড়া পর্যন্ত উঠে যেতো। (ইশতিরাকিয়াত রুশ কী তাজরিবাগাহ মেঁ)

মোটকথা, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ হাজারো রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বাণী শুনিয়েও বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। বস্তুবাদের আবহমানকালের ধারা এটাই। বস্তুতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থাই মানবজাতিকে স্বাচ্ছন্দ্যের পথ দেখিয়ে দিতে পারেনি এবং পারবেও না। পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র ও অদ্বিতীয় এক জীবন বিধান, যেখানে রাজা-প্রজার কোন ব্যবধান নেই, আমীর-গরীবের কোন পার্থক্য নেই, মালিক-শ্রমিক ভেদাভেদ নেই। ইসলামই সেই অতুলনীয় এবং অনবদ্য ধর্ম, যেখানে নেই শ্রেণী-সংগ্রামের রক্তের দাগ কিংবা মানবতার টুঁটি চেপে ধরা পাশবিকতা।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যন্ত উঁচুতে। শ্রমকে ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না; বরং অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখে থাকে। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

অর্থ : যখন তোমাদের সালাত আদায় হয়ে যায় তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশে ব্যাপৃত হয়ে যাও। (সূরা জুমু'আ- ১০)

হাদীসে পাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح

অর্থ : শ্রমজীবির উপার্জনই উৎকৃষ্টতর, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়। (মুসনাদে আহমাদ; হা. নং ৮৩৯৩)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে,

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.

অর্থ : যে ব্যক্তি আপন শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখো, আল্লাহর নবী দাঊদ আলাইহিস সালাম আপন শ্রমলব্ধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। (সহীহ বুখারী; হা. নং ২০৭২)

অবশ্য ইসলাম যেমনিভাবে শ্রম ও হালাল উপার্জনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছে, ঠিক এর বিপরীতে কোন পরিশ্রম না করে সমাজের গলগ্রহ হয়ে থাকারও কঠোর নিন্দা করেছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করবে না তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। (সুনানে আবূ দাউদ)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে মহান আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে তার চেহারায় এক টুকরো গোশতও থাকবে না। (সহীহ বুখারী)

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদীসে শ্রমিক অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আমরা এখানে ইসলাম-প্রদত্ত শ্রমিক অধিকারের মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

ক. সামাজিক মর্যাদা

ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা শ্রমিক সম্প্রদায়কে মানবিক ও সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কিংবা মতবাদে শ্রমিকদেরকে সামাজিক মর্যাদা দেয়া হয়নি। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে তারাই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যারা বেশি আল্লাহভীরু। (সূরা হুজুরাত- ১৩)

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ধনী-গরীবে কোন বৈষম্য নেই। মালিক-শ্রমিকের ব্যবধান নেই। বরং সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। উল্লিখিত আয়াতের বাস্তব নমুনা আমরা দেখতে পাই অগণিত নবী রাসূলের পবিত্র যিন্দেগীতে, খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক জীবনীতে এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবীদের আদর্শ জীবনে।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দুনিয়াতে আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি বকরী চরাননি। তখন সাহাবীগণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি বকরী চরিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমি এক কিরাত, দু'কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরী চরিয়েছি। (সহীহ বুখারী)

অপর এক হাদীসে এসেছে, হযরত দাঊদ আ. কর্মকার ছিলেন, হযরত আদম আ. কৃষক ছিলেন, হযরত নূহ আ. ছিলেন ছুতার, হযরত ইদরীস আ. ছিলেন দর্জি আর মূসা আ. বকরী চরিয়ে জীবনযাপন করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)

এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর মধ্যে হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী রাযি. সকলেই আপন শ্রমলব্ধ উপার্জনের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শ্রমিকের ভূমিকায় কাজ করতে ইসলামী সমাজে লজ্জার কিছুই ছিলো না। অতএব একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইসলামে শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি।

খ. শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণ

একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে কাজ করে। তেমনিভাবে শ্রমিকেরা অন্নকষ্ট লাঘবের জন্যই প্রধানত কাজ করে থাকে। তাদের রক্ত পানি করা শ্রমের ফসল ভোগ করে মালিকরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করে। তাই শ্রমিকদের জীবনধারণের জন্য মজুরী বা পারিশ্রমিক দিতে হয়। এই মজুরী নিয়েই যতসব সংঘাত ও বিবাদের সৃষ্টি। পীড়াদায়ক হলেও অনিবার্য বাস্তবতা এই যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন মতবাদই শ্রমিকের মজুরী সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারেনি– না পুঁজিবাদ, না সমাজবাদ। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় পারিশ্রমিক নির্ধারণের মূল সূত্র হলো, দ্রব্যমূল্য যেমনিভাবে চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের মূল্যও তেমনি চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নির্ধারিত হবে। এটা স্পষ্ট যে, এ ব্যবস্থায় শ্রমিকরা দ্রব্যবস্তুর মত প্রাণহীন, নির্জীব এবং

অসহায়। আর পারিশ্রমিক নির্ধারণ প্রশ্নে সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্যই হচ্ছে, দক্ষতা ও যোগ্যতানুযায়ী কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক। এ ব্যবস্থায় শ্রমিকরা স্রেফ একটি অনুভূতিহীন রোবট বা যন্ত্রে পরিণত হয়। এখানে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই থাকে না।

অথচ একমাত্র ইসলামই দিয়েছে শ্রমিকের পারিশ্রমিক সমস্যার যথার্থ সমাধান। কেননা ইসলামী অর্থনীতিতে ন্যূনতম পারিশ্রমিক প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী ও পারিশ্রমিক দিতে হয় যাতে সে তার জীবনধারণের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারিশ্রমিক নির্ধারণ ব্যতিরেকে শ্রমিক থেকে শ্রম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ)

অপর এক হাদীসে যথাসময়ে শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদানে গুরুত্বরোপ করে ইরশাদ হয়েছে,

اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ.

অর্থ : তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। (সুনানে বাইহাকী)

গ. শ্রমিকের সুস্থতা

ইসলাম কখনো কারো উপর এমন নির্দেশ চাপিয়ে দেয় না যা পালন করা তার জন্য দুঃসাধ্য বা অসম্ভব। বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম অর্থনীতিবিদ আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেছেন, শ্রমিকের কাছ থেকে (মালিকের জন্য) অতটুকুই কাজ নেয়া উচিত যতটুকু সে সহজভাবে, সুষ্ঠুপন্থায় আঞ্জাম দিতে পারে। (আল-মুহাল্লা লি-ইবনিল হাযম) এমনিভাবে ইসলাম শিক্ষা-দীক্ষা ও বাসস্থানের ক্ষেত্রেও শ্রমিকের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

ঘ. শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের মে মাস। হঠাৎ করেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আমেরিকার শিকাগো সিটির রাজপথ। পিচঢালা সড়কে লুটিয়ে পড়ে বেশ কিছু শ্রমিকের লাশ। এখানে শ্রমিকরা প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টার পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা শ্রমের সময়সীমা নির্ধারণের দাবিতে বিক্ষোভ করছিল। অবশেষে শ্রমিকের রক্তচোষা পুঁজিপতিরা 'আট ঘণ্টা'র দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন, যে আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও একাত্মতা ঘোষণার লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও 'মে দিবস' পালন করা হয়। অথচ ইসলাম সুদীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেই ঘোষণা করেছে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অর্থ : আল্লাহ কাউকে এমন কোন কাজের দায়িত্ব দেন না যা তার সাধ্যাতীত। (সূরা বাকারা- ২৮৬)

এ মূলনীতির আলোকে ইসলাম কাজের ক্ষমতা, প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ী শ্রমের পরিমাণ ও সময় নির্ধারণের নির্দেশ প্রদান করে।

ঙ. স্থান পরিবর্তনের অধিকার

মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে। এই ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা মানেই যুলুম ও অবিচার। অথচ পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ উভয় ব্যবস্থাতেই শ্রমিকের স্থানান্তর গমনের অধিকারকে বাতিল করে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। (পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্থানান্তর গমনের অধিকার পুরোপুরি রহিত করা না হলেও এ ব্যাপারে এমন জটিলতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যে, শ্রমিকগণ এ থেকে সুফল ভোগ করতে পারে না।)

সমাজতন্ত্রের অন্যতম অন্ধভক্ত স্ট্যালিনের আমলে এক সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল, 'মাসিক অথবা রোজভিত্তিক যে কোন মজুরই হোক না কেন তাকে স্বাধীনভাবে শ্রমের ক্ষেত্র ও স্থান পরিবর্তনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এ নির্দেশ অমান্য করলে ২ থেকে ৪ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

কত অমানুষিক ও বর্বরোচিত কালাকানুন! অথচ শান্তির ধর্ম, চিরকল্যাণের ধর্ম ইসলাম শ্রমিকের এই স্বাভাবিক স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে ঘোষণা দিয়েছে, সমস্ত দেশ ও যমীন আল্লাহর, আর সমস্ত মানুষ আল্লাহর বান্দা। তাই যেখনেই তুমি মঙ্গলজনক মনে কর সেখানেই বাস করো। (মাজমাউয যাওয়াইদ)

চ. লাভের অংশীদারিত্ব

ইসলামই একমাত্র মতবাদ যেখানে শ্রমিকের লভ্যাংশে শরীক হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। (মুসনাদে আহমাদ)

ছ. দাবি পেশ করার সুযোগ

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি দিকের এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াবলীরও বিস্ময়কর সমাধান দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামে শ্রমিকের অন্যান্য অধিকারের ন্যায় দাবি-দাওয়া পেশ করারও পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার রয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুওয়াল করা বা অন্যের কাছে কিছু প্রার্থনা করা একটি পেষণযন্ত্র; যার দ্বারা মানুষ তার নিজের চেহারাই পিষে ফেলে। কিন্তু কোন মানুষ যদি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী করে বা যা ব্যতীত সে বাঁচতে পারে না এমন জিনিসের দাবী নিয়ে আসে তবে সেটা সুওয়াল ও প্রার্থনা হবে না। (আল-মাবসূত)

উল্লিখিত মৌলিক অধিকার ছাড়াও ইসলাম শ্রমিকের চাকুরির নিরাপত্তা, কাজের প্রকৃতি, বাসস্থান, অসুস্থকালীন পেনশন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

উপসংহার

সার্বিক জীবনে ইসলাম যে অনুপম সমাজ ব্যবস্থার পথ বাতলে দেয় এর প্রত্যেকটি যদি স্ব-স্ব স্থানে, পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে এমন এক বৈষম্যহীন সামাজিক-রীতির উদ্ভব হবে যাতে রানা প্লাজার 'রানা'র মতো সৃষ্টি হবে না অসংখ্য টাকার কুমির। শত শত শ্রমিক খুন করেও সম্পূর্ণ টাকার জোরে সে জামাই আদরে আছে। গত পাঁচ বছরেও তার কোন শাস্তি হয়নি। হয়তো একসময় বেকসুর খালাসও পেয়ে যেতে পারে!! ইসলামী হুকুমত না থাকার এই হলো আযাব।

অন্যদিকে গজিয়ে উঠবে না লাঞ্ছিত, অধিকার-বঞ্চিত ভুখা-নাঙ্গা শ্রেণী। বরং তখন এমন একটি অকল্পনীয় অথচ বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক জোয়ার সৃষ্টি হবে যার প্রাচুর্য অধিকাংশ মানুষই আস্বাদন করবে।

অতএব আসুন! আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের তথা শ্রমিক শোষণবাদের অভিশপ্ত শৃঙ্খল ভেঙে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার, সাম্য ও মুক্তির একমাত্র মতবাদ ইসলামের সোনালী আইন প্রতিষ্ঠা করি। এতেই প্রতিষ্ঠা হবে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার। এতেই আসবে বিশ্ব মযলুমানের মুক্তি। সকলেই খুঁজে পাবে শান্তিময় জীবনের সন্ধান।

লেখক : সিনিয়র মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

খতীব, লেক সার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা

অজস্র রহমত, বরকতের ডালি সাজিয়ে দরজায় কড়া নাড়ছে মাহে রমাযান। রমাযান কুরআনের মাস, ঈমানের মাস,

ফাযাইলে রমাযান

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

তাকওয়ার মাস। প্রত্যেক মুমিন বান্দা নিজের সাধ ও সাধ্য অনুযায়ী এ মাসের রহমত ও বরকত থেকে উপকৃত হয়।

এ মাসের মাহাত্ম্যও শ্রেষ্ঠত্ব অপরিসীম। রব্বে কারীম এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, প্রতিটি ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে বান্দাকে একান্ত আপন হওয়ার সুযোগ করে দেন। তার পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় বিচ্ছিন্ন বা দুর্বল হয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় জুড়তে ও মজবুত করতে। এ মাস নূরানিয়্যাত বৃদ্ধির, এ মাস রূহানিয়্যাতের উন্নতির, এ মাস সওয়াব ও প্রতিদান-সমৃদ্ধির। দয়ালু দাতার দয়ার সাগরে এ মাসে জোয়ার আসে। এ মাসে কোন আশান্বিতকে হতাশ করা হয় না এবং কোন যাঞ্চাকারীকে নিরাশ করা হয় না।

হাযারাত বুযুর্গানে দীন বলেন, রমাযানুল মুবারাকের আমল ও ইবাদতের প্রভাব সারা বছরের উপর পড়ে। রমাযানে যে ব্যক্তি সংশোধন হবে সে সারা বছরই এমন থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর যে ব্যক্তি রমাযানেও ভালো হতে পারলো না, নিষিদ্ধ কাজ ছাড়তে পারলো না সে হয়তো সামনেও পারবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আসন্ন রমাযানকে আমাদের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের উসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে রমাযানের ফযীলত

১. রমাযান কুরআনের মাস : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

অর্থ : রমাযান মাস, যাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা- ১৮৫)

২. তাকওয়া অর্জনের মাস : ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ : হে মুমিন সকল! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা বাকারা- ১৮৩)

৩. লাইলাতুল কদরের মাস : ইরশাদ হচ্ছে,

ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

অর্থ : লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়। সে রাত আদ্যোপান্ত শান্তি-ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত। (সূরা কদর- ৩-৫)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লাইলাতুল কদরকে রমাযানে গচ্ছিত রেখেছেন। আরো স্পষ্ট করে বললে; শেষ দশকে। মহিমান্বিত এ রাত সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। কত উত্তম? আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন। এ রাত পেয়ে যাওয়া যেমন সৌভাগ্যের, এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়াও চরম দুর্ভাগ্যের। হযরত আনাস বিন মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হলো। একমাত্র দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৭১৪৭)

৪. জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমাযান মাস আসলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৮, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৭৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৬৮২)

৫. শয়তান ও অবাধ্য জিনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয় : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমাযানের প্রথম রাতেই শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৬৮২, সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৯, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১০৭৯)

৬. গুনাহ মাফের মাস : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ...এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয় যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৩৩)

৭. দানশীলতার মাস : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ দাতা। তার দানশীলতা অধিকতর বৃদ্ধি পেতো রমাযান মাসে, যখন হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। হযরত জিবরাঈল আ. প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। ... যখন হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি হতেন বাধাহীন মুক্ত বাতাস অপেক্ষা অধিক দানশীল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২২০৮)

৮. রমাযানের প্রতি রাতেই অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয় : হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء. وذلك في كل ليلة. في الزوائد : رجال إسناده ثقات.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমাযান মাসে প্রত্যেক ইফতারের সময় অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। এমনটা প্রতি রাতেই হয়। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৭৪৪৩, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৬৪৩)

৯. সর্বোত্তম মাস : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلم ينشهر خير لهم من رمضان ولا أتى على المنافق ينشهر شر من رمضان وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم ... قال أحمد شاكر:إسناده صحيح.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমানদের জন্য রমাযান মাস অপেক্ষা উত্তম কোন মাস আসেনি। ... এ মাস মুমিনদের জন্য গনীমত স্বরূপ। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮৩৫০, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৩৩৩৫)

১০. এ মাসে আমলের সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়া হয় : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها (ما منعك أن تحجي معنا). قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال (فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة).

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাদের সাথে হজ্জ করোনি কেন? (কারণ জানানোর পর) ... আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, রমাযান মাস এলে উমরা করে নিও। রমাযানের উমরা হজ্জের সমান। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৭৮২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২৫৬)

রোযার ফযীলত

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে দিবেন : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (... والذي نفسي بيده لخلوف فما لصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها).

অর্থ : আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন, রোযা আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দেব। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৬৪, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪০৭)

মূলত সমস্ত আমলই আল্লাহ তা'আলার জন্য। কিন্তু আপন বৈশিষ্ট্যের কারণে রোযা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যধিক পসন্দনীয় আমল। এজন্য বলেছেন রোযা আমার জন্য অর্থাৎ, রোযা আমার নিকট অত্যধিক পসন্দনীয়। অন্যান্য আমলের সওয়াবের পরিমাণ, তা কতগুণ বৃদ্ধি করা হবে তা জানিয়ে দেয়া হলেও রোযারটা জানানো হয়নি। তা জানেন কেবল আল্লাহ তা'আলা।

'ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, প্রত্যেক আমলের সওয়াবের পরিমাণ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যা সাধারণত দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে আরো বাড়িয়ে দিবেন। তবে রোযা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রোযার প্রতিদান দিবেন অপরিসীম। একাধিক রেওয়ায়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا أجزي به.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের প্রতিটা আমল দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) তবে রোযা আমার জন্য আমিই এর প্রতিদান দেব। (অর্থাৎ অপরিমিত দেব, সীমাহীন দেব।)' (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫১)

অন্যত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال عند الله سبعة عملان موجبان، وعملان بامثالهما، وعمل بعشر أمثاله، وعمل بسبعمأة، وعمل لا يعلم ثواب عامله الا الله عز وجل... والصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله الا الله عز وجل.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (সওয়াবের বিবেচনায়) আমল সাত প্রকার। ... (তন্মধ্যে) এক প্রকার হলো, যার সওয়াব কেউ জানে না ... (তা হলো রোযা) রোযা আল্লাহ তা'আলার জন্য। এর সওয়াব আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। (শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৩৩১৭, ফাতহুল বারী ৪/১২৭)

কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদানের ঘোষণা শুনে রোযাদার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এত প্রতিদান দিবেন যে বান্দা খুশি হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে খুশি করে দিবেন। (তুহফাতুল আলমাঈ ৩/১৩৭)

২. জান্নাত লাভের পথ : হযরত আবূ উমামা রাযি. বলেন,

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة. قال عليك بالصوم، فإنه لا عد لله. ثم أتيته الثانية فقال لي عليك بالصيام. قال أحمد شاكر إسناده صحيح على شرط مسلم.

অর্থ : আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো; এর সমকক্ষ কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখো। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২১৪৯, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪৬৬, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ২৫৩০)

৩. রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষার ঢাল স্বরূপ : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা (জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার) ঢাল স্বরূপ। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৬৪)

রোযা খাহেশাতকে দুর্বল করার মাধ্যমে রোযাদারকে দুনিয়াতে গুনাহ থেকে এবং আখেরাতে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে। এজন্য রোযাকে ঢাল বলা হয়েছে।

৪. রোযাদার বিশেষ মর্যাদায় 'বাবুর রাইয়ান' দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে : হযরত সাহাল রাযি. থেকে বর্ণিত,

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد).

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে রাইয়ান নামে একটি দরজা আছে। উক্ত দরজা দিয়ে রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। (কিয়ামতের ময়দানে) বলা হবে রোযাদারেরা কোথায়? সুতরাং তারা দাঁড়াবে (এবং উক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে)। অতঃপর তা বন্ধ করে দেয়া হবে। অন্য কেউ তা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪০৯)

৫. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের ময়দানে রোযাদারকে পানি পান করাবেন: হযরত আবূ মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى في سرية في البحر فبينا هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف من فوقهم يهتف بأهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه فقال أبو موسى أخبر إن كنت مخبرا، قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি গরমের সময়ে তার জন্য পিপাসার্ত থাকবে তিনি পিপাসার (কিয়ামতের) দিনে তাকে (পরিতৃপ্তি সহকারে) পান করাবেন। (শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৩৬৩৭, মুসনাদে বায্যার; হা.নং ৪৯৪৭)

৬. কিয়ামতের ময়দানে রোযা সুপারিশ করবে : হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب أني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা ও কুরআন কিয়ামতের ময়দানে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি দিনের বেলায় তাকে খাবার গ্রহণ ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত রেখেছি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। সুতরাং উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ২০৩৬, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৬৬২৬, শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ১৯৯৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী; হা.নং ৮৮)

৭. রোযাদারের জন্য ফেরেশতারা দু'আ করেন : হযরত উম্মে উমারা বিনতে কাব রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلى فقالت إنى صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,... রোযাদারের নিকট যখন কেউ কোন খাবার গ্রহণ করে তখন তারা খাবার শেষ করা পর্যন্ত ফেরেশতারা রোযাদারের জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৮৫, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭৩৪৫, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪২১।

৮. রোযা গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

অর্থ : যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রমাযানের রোযা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৬০)

৯. রোযার সমকক্ষ কোন আমল নেই : হযরত আবূ উমামা রাযি. হতে বর্ণিত,

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم، فإنه لا عدلله. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

অর্থ : হযরত আবূ উমামা রাযি. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কোনটি? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি রোযা রাখো; রোযার সমকক্ষ কিছু নেই। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ১৫৩৩(সনদ সহীহ), সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪১৬, সুনানুন নাসাঈ; হা.নং ২২২)

১০. রোযাদারের দু'আ ফেরত দেয়া হয় না : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر، والامام العادل، ودعوةالمظلوم يرفعها الله فرق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দু'আ ফেরত দেয়া হয় না–

(এক) রোযাদারের দু'আ যতক্ষণ না সে ইফতার করে।

(দুই) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ।

(তিন) মযলুমের দু'আ। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ সমস্ত দু'আ মেঘের উপর উঠিয়ে নেন, আসমানের দরজা খুলে দেন এবং বলেন, আমার ইয্যতের কসম! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো; কিছুদিন পরে হলেও। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৮০৩০, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৫৯৮, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪১৯)

১১. রোযাদারের খুশি দুইবার : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযাদারের খুশি দু'টি, যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে তখন খুশী হয়। আর যখন তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে তখন (রোযার প্রতিদান পেয়ে) খুশী হবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৬৬)

১২. রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও উৎকৃষ্ট : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك.

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও উৎকৃষ্ট। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৮৯৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৫১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭৬৪)

সিনিয়র মুহাদ্দিস, আশরাফুল মাদারিস,
সতীঘাটা, সদর, যশোর
খতীব, বাইতুল মুআযযম জামে মসজিদ,
কাঠেরপুল, যশোর

শাওয়াল মাসের বিশেষ আমল; ছয় রোযা ও বিবাহ

মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

হিজরী বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী রমাযান-পরবর্তী মাসটি শাওয়াল মাস। মাহে রমাযানের সোহবত-ধন্য এ মাসটিও অনেক বরকতময় ও গুরুত্বপূর্ণ। হাদীস শরীফের বিবরণ অনুযায়ী শাওয়াল মাসে মুমিনদের জন্য বিশেষ দু'টি ইবাদত রয়েছে।

এক. ছয়টি রোযা রাখা।

দুই. বিবাহ কার্য সম্পাদন।

শাওয়ালের ছয় রোযার বিবরণ

ফাযাইল :

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.

অর্থ : যে ব্যক্তি রমাযানের রোযাগুলো রাখলো, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১১৬৪)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারা বছর রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো (যে, তা কেমন?)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে (সুতরাং সারা বছর রোযা রাখার দরকার নেই)। তুমি রোযা রাখো রমাযানে, রমাযান পরবর্তী (শাওয়াল) মাসে ও প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবারে, তাহলে তুমি যেন সারা বছরই রোযা রাখলে। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৪৩২)

মাসাইল :

১. ছয় রোযা একাধারেও রাখা যায় আবার মাঝে বিরতি দিয়েও রাখা যায়। তবে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখা উত্তম। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৪৩৫)

২. শাওয়ালের ছয় রোযা স্বতন্ত্র নফল রোযা। তাই শাওয়াল মাসে কাযা রোযা বা মান্নতের রোযা রাখলে ছয় রোযার ফযীলত পাওয়া যাবে না; বরং ভিন্ন করে নফল রোযা রাখতে হবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/২২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৭)

৩. কারো যিম্মায় যদি রমাযানের রোযা কাযা থাকে তাহলে তার জন্য শাওয়ালের ছয় রোযা রাখার চেয়ে কাযা রোযা রাখা উত্তম হবে। কেননা ফরয থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়া নফলে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে উত্তম। মোটকথা সে কাযা রোযা রাখার পর ছয় রোযা রাখবে। (ফাতাওয়া দীনিয়্যা ৩/৭২)

৪. শাওয়ালের ছয় রোযার সাথে কাযা রোযার নিয়ত করা যাবে না। বরং যে কোন একটার নিয়ত করবে। ছয় রোযার নিয়ত করলে রোযাটা নফল হবে। আর কাযার নিয়ত করলে কাযা আদায় হবে। (কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৯৫)

শাওয়াল মাসে বিবাহ কার্য সম্পাদন

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং এ মাসেই রুখসতী (বাসর যাপন) করেছেন। সুতরাং তার কাছে আমার চেয়ে আর কোন নারী বেশি ভাগ্যবতী? বর্ণনাকারী বলেন, এজন্য হযরত আয়েশা রাযি. শাওয়াল মাসে নারীদের রুখসতীকে পছন্দ করতেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৪২৩)

যে কোন মাসে, যে কোন দিন বিবাহ জায়েয। তবে শাওয়াল মাসে বিবাহ হওয়া একটি সুন্নাত, শুক্রবারে হওয়া একটি সুন্নাত, আর মসজিদে হওয়া আরেকটি সুন্নাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ মসজিদেই সম্পাদন করতেন। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/২৬৫)

সুন্নাত তরীকায় বিবাহ সুখময় দাম্পত্য জীবন লাভের অনন্য মাধ্যম।

বিবাহের গুরুত্ব

মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে তার বিশেষ নিদর্শনাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ : আর তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের যুগল সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা রূম- ২১)

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. বলেন, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের সারমর্ম হচ্ছে, মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বিদ্যমান আছে, সে পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যা-ই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। এ কথাও বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়ত সম্মত (সুন্নাত তরীকায়) বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীতে হারাম রীতি-নীতির প্রচলন ঘটিয়েছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না। (মা'আরিফুল কুরআন; পৃষ্ঠা ১০৪১, সংক্ষিপ্ত)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা অভিভাবকদের প্রতি আদেশ করেছেন–

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর- ৩২)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى.

অর্থ : স্বয়ং আমি নারীদেরকে বিবাহ করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৬৩)

বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের অর্ধেকটা পূর্ণতা লাভ করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اذا تزوج العبد فقد كمل نصف الايمان فليتق الله فى النصف الباقى.

অর্থ : যখন বান্দা বিবাহ করলো তখন তার অর্ধ-ঈমান পূর্ণ হয়ে গেলো। সুতরাং এখন সে যেন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। (শু'আবুল ঈমান লিল-বাইহাকী; হা.নং ৫১০০)

বিবাহের বিধান

সুন্নাতে মুআক্কাদা : কারও অবস্থা যখন স্বাভাবিক হবে (অর্থাৎ বিবাহ না করলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই) এবং সে স্ত্রীর মহর, ভরণ-পোষণ ও স্ত্রীর হক আদায়ে সক্ষম হবে, তখন তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। এটি এমন একটি সুন্নাত যা হযরত আদম আ. থেকে শুরু হয়েছে, এখনো আছে এবং জান্নাতেও থাকবে।

ওয়াজিব : বিবাহ না করার কারণে হারামে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিবাহ করা ওয়াজিব।

মাকরূহ/হারাম : ফরয ও সুন্নাত দায়িত্ব তরক করা ও স্ত্রীর প্রতি যুলুমের আশঙ্কা থাকলে বিবাহ করা মাকরূহে তাহরীমী/ হারাম (ফাতাওয়া শামী ৩/৬)

সুন্নাতী বিবাহের রূপরেখা

সুন্নাতী বিবাহের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, স্বল্প খরচে বিবাহের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা। খরচ কম হওয়াই বরকতের কারণ। অপচয় ও অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة.

অর্থ : সবচেয়ে কম খরচের বিবাহ সবচে' বরকতপূর্ণ।

সুতরাং সুন্নাতী বিবাহে কোন আড়ম্বর ও লৌকিকতা নেই এবং কোন অপচয় ও অপব্যয়ও নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় নবীজীর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী এতটাই সাদামাটাভাবে বিবাহ করেন যে, স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও জানানো তারা প্রয়োজন মনে করেননি। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি., হযরত জাবের রাযি. এবং রাবি'আ আসলামী রাযি.-এর বিবাহের ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুন্নাত তরীকায় বিবাহের জন্য যে সকল বিষয় লক্ষণীয়-

১. পাত্র-পাত্রীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা।
২. পাত্র নির্বাচন।
৩. পাত্রী চয়ন।
৪. কুফু বা সমতা রক্ষা।
৫. পাত্রীকে একনজর দেখে নেয়া।
৬. বর-কনের সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।
৭. মহর নির্ধারণ করা।
৮. কনের ইযন বা সম্মতি গ্রহণ।
৯. বিবাহ পড়নোর নিয়ম।
১০. ওয়ালিমার আয়োজন।

পাত্র-পাত্রীকে যোগ্য করে গড়ে তোলা :

পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো, সন্তানকে দীন-দুনিয়ার বিশেষ করে বৈবাহিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা। দীনদার এবং চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা। মোটকথা, ছেলের পিতা-মাতা ছেলেকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে সে মাসআলা-মাসাইল জেনে স্ত্রীর যাবতীয় হক আদায় করতে পারে। ফলে স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সংসার সুখের হয়, এবং আনেওয়ালা বংশধরদের যোগ্য অভিভাবক হতে পারে।

অনুরূপভাবে মেয়েকেও এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে বিবাহের পর স্বামীর যাবতীয় হক আদায় করে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে, সন্তানদের জন্য আদর্শ মা হতে পারে।

পাত্র নির্বাচন :

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচে' লক্ষণীয় বিষয় হলো, পাত্র দীনদার ও চরিত্রবান হওয়া। যদি এমনটি না হয় তাহলে সে তো আল্লাহর হকই আদায় করবে না, তার বান্দীর হক আদায় করবে কিভাবে? নারীরা সাধারণত অবলা ও নিরীহ। সুতরাং স্বামী যদি অসদাচারী, ধর্মহীন ও পাপাচারী হয় তাহলে তার যতই সম্পদ থাকুক, স্ত্রী কখনো সুখী হতে পারবে না। তার পার্থিব সুখ-শান্তি বিলীন হওয়ার পাশাপাশি আখেরাতও বরবাদ হয়ে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد عريض.

অর্থ : যখন তোমাদের নিকট এমন লোক বিবাহের প্রস্তাব দেয় যার দীনদারী ও আখলাক-চরিত্র তোমরা পছন্দ করো, তখন বিবাহ দিয়ে দাও (ধন-সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করো না)। তা যদি না করো তাহলে দেশে ব্যাপকহারে ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১০৮৪)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها.

অর্থ : যে তার আদরের দুলালীকে কোন পাপাচারীর নিকট বিবাহ দিলো সে রক্ত সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৮৭০৭)

ইতিহাসের সাক্ষী

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের পিতা মুবারক রহ. বনু তামীম গোত্রাধীন বনু হানযালা বংশের এক অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী ব্যক্তির গোলাম ছিলেন। মনিব তাকে একটি আনারের বাগানের মালি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে। মুবারক রহ. ছিলেন অনেক বড় মাপের মুত্তাকী-পরহেযগার। মনিব একদিন তাকে বাগান থেকে একটি টক আনার আনতে নির্দেশ দেয়। তিনি অনেক চিন্তা-ফিকির করে একটি আনার নিয়ে আসেন। কিন্তু সেটি মিষ্টি হলো। মনিব বললো, তোমাকে টক আনার আনতে বললাম, তুমি নিয়ে এসেছো মিষ্টি আনার! মুবারক রহ. বললেন, কোনটি টক, কোনটি মিষ্টি, সেটা আমি কিভাবে জানবো? আমি তো আনার খেয়ে দেখিনি। মনিব বললো, তুমি এতদিন কোন আনার খাওনি?! মুবারক রহ. বললেন, কিভাবে খাবো? আপনি তো আমাকে দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন মাত্র; খাওয়ার অনুমতি তো দেননি! আমার দায়িত্ব যা ছিলো সেটা পালন করেছি। মনিব তার দীনদারী ও আমানতদারীতে খুবই সন্তুষ্ট হলো এবং তাকে মালির দায়িত্ব থেকে খাসমহলে নিয়ে আসলো।

একদিন মনিব তার মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে মুবারক রহ. এর সাথে পরামর্শ করলো যে, মেয়েকে কেমন পাত্রের কাছে পাত্রস্থ করা যায়? তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতাপূর্ণ জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আরবের মুশরিকরা বংশ মর্যাদা দেখে মেয়ে বিবাহ দিতো। ইহুদীরা দিতো ধন-সম্পদ দেখে, আর খ্রিস্টানরা সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু ইসলামে ধর্তব্য দীনদারীর। এ চারটি বিষয় থেকে যেটা ভালো লাগে আপনি সেটি করতে পারেন।

মনিবের কাছে এই উত্তর দারুন ভালো লাগলো এবং বাসায় গিয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলো যে, আমার তো মন চাচ্ছে, মুবারকের কাছেই আমার মেয়েকে বিয়ে দেই! কেননা সে যদিও গোলাম; কিন্তু তাকওয়া-পরহেযগারী ও দীনদারীতে যুগের সম্রাট। স্ত্রীও তার এ মনোভাবকে সমর্থন জানালো। এভাবে একজন আমীর তার মেয়ের বিবাহ 'ফকীর' মুবারক রহ.-এর সাথেই সম্পন্ন করলো। আল্লাহ তা'আলা এ বিবাহের বরকত এভাবে প্রকাশ করলেন যে, এ দম্পতিকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর মত ক্ষণজন্মা সন্তান দান করলেন, হাদীস শাস্ত্রসহ দীনের প্রায় সকল শাস্ত্রেই যার পাণ্ডিত্য প্রবাদতুল্য। প্রসিদ্ধ আছে, তিনি বছরে চারমাস হাদীসের দরস দিতেন। চারমাস জিহাদে কাটাতেন। চারমাস হালাল রিযক অন্বেষণে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন; পৃষ্ঠা ১৪৯)

সতর্কতা

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং উক্ত ঘটনা থেকে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রের দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখার গুরুত্ব কতটা অপরিসীম তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ

লোকজন ব্যাপকভাবে এবং দীনদার নামে পরিচিতদের একটা বড় অংশ আলেমদেরকে এমনিতে তো পছন্দ করেন কিন্তু 'পাত্র' হিসেবে পছন্দ করেন না। অথচ দু-চারটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে সর্বযুগে আলেম শ্রেণীই সমাজের সর্বাধিক দীনদার হিসেবে বিবেচিত ও পরিচিত। ফাতাওয়া শামীতে আল্লামা শামী রহ. 'বিবাহে পাত্র-পাত্রীর সমতা বিধান' প্রসঙ্গে বলেন, আলেম ব্যক্তি শাহযাদীকেও বিবাহ করার যোগ্য এবং উপযুক্ত। (ফাতাওয়া শামী ৩/৮৪, শামেলা সংস্করণ)

আলেমদেরকে পাত্র হিসেবে পছন্দ না করলে আলেমদের কোন ক্ষতি নেই। ক্ষতি যা তার সবটাই অপছন্দকারীর; দুনিয়াতেও আখেরাতেও।

অপছন্দকারীরা সম্ভবত আলেমের কাছে বিবাহ দিলে মেয়েকে খাওয়াবে কী, পরাবে কী, নিজেই তো চলতে পারে না, বউ পালবে কেমনে– এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে এটা করে থাকেন। সম্ভবত তারা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন। সস্তা খেয়ে, সস্তা পরেও আলেম পরিবারগুলো এ সময়ে সবেচেয়ে সুখময় জীবন যাপন করছে। অভিজ্ঞতা এবং জরীপ কিন্তু সে কথাই বলছে। হ্যাঁ, সমাজের আর দশটি পরিবারের মতো কোন কোন আলেমের সংসারেও অভাব-অনটন থাকতে পারে এবং আছেও, কিন্তু সেখানে অভিযোগ ও হাহাকার নেই। ব্যক্তিক্রমও আছে, তবে ব্যতিক্রম তো প্রমাণ হতে পারে না।

যাই হোক, দীনদার বলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গের আলেমপাত্রের প্রশ্নে নাকউঁচা-ভাবটি সংশোধনযোগ্য।

দেখুন না, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত খাদীজা রাযি.-কে বিবাহ করেন তখন খাদীজা রাযি. ধনাঢ্য নারী ছিলেন। সেই তুলনায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর্থিক সঙ্গতি তেমনটা ছিলো না। তাই চাচা আবূ তালিব বিবাহের খুতবায় খাদীজা রাযি.-এর বংশের লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিশ্চয় আমার এ ভাতিজা আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ– আভিজাত্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, মর্যাদা ও বিচক্ষণতায় কাউকে তাঁর সাথে তুলনা করা চলে না। যদিও তাঁর ধন-সম্পদ কম। কেননা ধন-সম্পদ অপসৃয়মান ছায়া এবং ক্ষয়িষ্ণু বস্তু...। অচিরেই তাঁর অনেক মর্যাদা ও মহান শান প্রকাশ পাবে।... (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রশাদ ২/১৬৫)

অবশ্য কোন নির্দিষ্ট আলেমপাত্রকে কারণবিশেষ অপছন্দ করা দোষণীয় নয়।

পাত্রী নির্বাচন :

কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে দীনদার, অধিক সন্তান প্রসবকারী, অধিক স্বামীসোহগী, সহজ-সরল ও নেককার পাত্রী সবচেয়ে উত্তম হিসেবে বিবেচিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাধারণত ৪টি বিষয় দেখে বিবাহ করা হয়। (১) ধন-সম্পদ, (২) বংশ মর্যাদা, (৩) সৌন্দর্য ও (৪) দীনদারী। তুমি দীনদারীকে গ্রহণ করে কামিয়াব হও। অন্যথায় তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৯০)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, মুমিন বান্দা নেককার স্ত্রীর তুলনায় উত্তম কোন জিনিস অর্জন করতে পারে না। (আর নেককার স্ত্রী হলো,) যাকে সে আদেশ করলে পালন করে, তার দিকে তাকালে (জ্ঞানে ও গুণে) তাকে আনন্দিত করে, স্বামী কোন কিছুর শপথ করলে তা পূর্ণ করতে সাহায্য করে এবং স্বামী অনুপস্থিত থাকলে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ হিফাযত করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৫৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, তোমরা অধিক স্বামীসোহাগী ও অধিক সন্তান প্রসবকারী নারীকে বিবাহ করো। কেননা আমি (কিয়ামতের দিন) উম্মতের আধিক্যে গর্ব করবো। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২০৫০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা সতী-সাধ্বী, সরলমতী ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকাল ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি। (সূরা নূর- ২৩)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, সহজ-সরল হওয়া, সরলমতি হওয়া মেয়েদের বিশেষ গুণ। অথচ আজকাল সরলতাকে মেয়েদের দোষ বিবেচনা করা হয়, চালাক-চতুর, বাজার-ঘাট চেনে, অফিস-আদালত করতে পারে এমন মেয়ের খোঁজ করা হয়। অবশ্য বুদ্ধিমতি হওয়া এবং সরলমতি হওয়ার মধ্যে বৈপরিত্ব নেই। একই সঙ্গে দুটো গুণ জড়ো হতে পারে।

এছাড়া পাত্র-পাত্রী উভয়ের মধ্যে সবচে' যে বিষয়টি বেশি লক্ষ্য রাখা জরুরী সেটি হলো তাকওয়া তথা খোদাভীতি। যেমনটি আমরা মুবারক রহ. এর ঘটনায় দেখেছি।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রাযি. এর যুগের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গভীর রাতে একমেয়েকে তার মা দুধে পানি মেশাতে বলছিলো। মেয়েটি তার মাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। উমর রাযি. ছদ্মবেশে তা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করলেন এবং পরবর্তীতে তাকে নিজের ছেলের (শাহজাদার) সাথে বিবাহ দিলেন। পরবর্তীতে সে দম্পতির বংশধারা থেকেই হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর মতো কালজয়ী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের খুতবায় যে তিনটি আয়াত পাঠ করতেন সবগুলোই তাকওয়া সম্পর্কে। সুতরাং তাকওয়ার বিষয়টিকেই অগ্রগণ্য রাখতে হবে।

কুফু বা সমতা রক্ষা :

পাত্র নির্বাচন করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পারস্পরিক সমতা-সামঞ্জস্যতার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা। বংশ মর্যাদা, দীনদারী, ধন-সম্পদ ও পেশাগত দিক দিয়ে ছেলের পরিবার ও মেয়ের পরিবারের মাঝে সমতা থাকা বঞ্ছনীয়। (ফাতাওয়া শামী ২/১৬৫)

অন্যথায় বিবাহের পরে তাদের মাঝে কলহ-বিবাদ ও মনোালিন্য হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত গড়ায়।

বিবাহপূর্ব প্রেম বা প্রেমপরবর্তী বিবাহ

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, আমাদের সমাজে সহশিক্ষার বিষফল হিসেবে ছেলে-মেয়ের যে অবৈধ প্রেম লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তা খুবই ন্যাক্কারজনক। এতে বহু নাজায়েয কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। চোখের যিনা ও কানের যিনাসহ বহু হারাম কাজ হয়। অতঃপর মহব্বতের আতিশয্যে একপর্যায়ে তাদের মাঝে যখন বিবাহ সংঘটিত হয় তখন যেহেতু এ বিয়ের ভিত্তি ছিলো হারামের উপর–আর জানা কথা যে, হারামে আরাম নাই– সুতরাং এ বিবাহে শান্তির মুখ দেখা যায় না।

জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রেমের বিবাহের বৈশিষ্ট্য হলো তালাক। আর তালাকের বৈশিষ্ট্য হলো তালাকে পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আগের তুলনায় আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু কথায় আছে, বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার পর আফসোস করে কী লাভ? সুতরাং এ প্রেমিক-প্রেমিকা সারাজীবন আফসোস করেও শান্তি আর খুঁজে পাবে না।

কোর্টম্যারেজ প্রসঙ্গ

অবৈধ প্রেমের আরেক কুফল হলো কোর্টম্যারেজ। সমতা না থাকায় মেয়ে

পক্ষ মেনে না নেয়ার কারণে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা কোর্টের আশ্রয় নিয়ে অভিভাবক ছাড়া নিজেরাই বিবাহকার্য সম্পাদন করে। বিষয়টি লজ্জাজনক হওয়ার পাশাপাশি নাজায়েযও বটে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل.

অর্থ : যে নারীই অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে তার বিবাহ বাতিল। তার বিবাহ বাতিল। তার বিবাহ বাতিল। (সুনানে দারিমী; হা.নং ২০৫০)

পাত্রী দেখা :

পাত্রী দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব। জনৈক সাহাবী এক আনসারী মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছো? সে বললো, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাও, তুমি তাকে দেখে নাও। কেননা আনসারী নারীদের চোখে সমস্যা থাকে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪২৪)

মহরের পরিমাণসহ সবকিছু পাকাপাকি হয়ে গেলে গোপনীয়ভাবে শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীর চেহারা দেখতে পারবে। বিস্তারিত দেখতে হলে ছেলেপক্ষের মহিলাদেরকে পাঠাবে।

বর-কনের সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবগতি লাভ :

আলোচ্য বিবাহে বর-কনের সন্তুষ্টি আছে কি না, সেটা জেনে নিবে। তাদের পারস্পরিক পছন্দ-অপছন্দের মতামত গ্রহণ করবে। যার সাথে দু'টি মানুষের সারা জীবনের সুখ-দুঃখের সম্পর্ক তার মতামত না নিয়ে শুধু চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। আপত্তি থাকলে জবরদস্তি করা উচিত নয়। কেননা এতে তাদেরকে বিরোধপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। এর পরিণতি খুব একটা ভালো হয় না। কাজেই এটা শরীয়তের দৃষ্টিতেও গর্হিত এবং সুস্থবিবেক পরিপন্থী।

মহর নির্ধারণ করা :

ছেলের সঙ্গতি অনুযায়ী মহর ধার্য করবে। শরীয়তে মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী মহর নির্ধারণ করবে। তবে সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, আড়াই ভরি রূপা বা রূপার মূল্য, যার বর্তমান বাজারমূল্য আনুমানিক আড়াই হাজার টাকা। মহরের মধ্যে অস্পষ্টতা রাখবে না। রূপা বা সোনা দ্বারা মহর ধার্য করলে তখনকার বাজার দর হিসেবে তার মূল্য কত সেটাও উল্লেখ করবে।

কনের ইযন বা সম্মতি গ্রহণ :

বিবাহের জন্য কনের ইযন বা সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক। কনের ইযন গ্রহণের জন্য কনের পিতা, দাদা, নানা, ভাই, চাচা, মামা বা যে কোন একজন মাহরাম যথেষ্ট। ইযন গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন স্বাক্ষীর প্রয়োজন নেই। ইযন গ্রহণকারী বলবে, অমুক ছেলে, তার শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক অবস্থা এই, এত পরিমাণ মহর ধার্যসাপেক্ষে তোমার সাথে তার বিবাহ হবে, তুমি কি এতে রাজি আছো? কনে কুমারী হলে প্রস্তাব শুনে তার চুপ থাকা, স্বাভাবিকভাবে কাঁদা, হাসা অথবা সুস্পষ্ট মৌখিক সম্মতি সবকিছুই রাজি থাকার প্রমাণ। আর বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হলে স্পষ্ট মৌখিক সম্মতি জরুরী।

বিবাহ পড়ানোর নিয়ম :

প্রথমে একজন খুতবা পড়বেন (মাসনূন খুতবা, তাকওয়ার তিনটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস হলে ভালো)। অতঃপর মেয়ের ইযন গ্রহণকারী উকীল কমপক্ষে দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষীর সামনে ছেলেকে প্রস্তাব করবে (উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার বড় মেয়ে অমুককে আপনি মাওলানা আব্দুল্লাহ পিতা জনাব আব্দুর রহমান-এর নিকট মহরে ফাতেমী তথা ১৫০ তোলা রূপার সমপরিমাণ মূল্য দেড় লক্ষ টাকা মহরের বিপরীতে বিবাহ দিলাম), তখন ছেলে কবুল করবে। সাক্ষীদের নিজ কানে ইজাব-কবুলের কথাগুলো শোনা আবশ্যক। এরপর উপস্থিত সকলে দু'আ পড়বে- بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ. (মিশকাতুল মাসাবীহ ২/২৭৮)

এরপর ছেলেপক্ষ বা মেয়েপক্ষ (যার এলাকায় বিবাহ হবে) উপস্থিত লোকদের মধ্যে কিছু খুরমা বিলিয়ে দিবে। সকলে খেয়ে চলে যাবে।

ওলীমার দাওয়াত :

বিবাহের মধ্যে দু'টি খরচ। উভয়টি স্বামীর যিম্মায়।

এক. মহর প্রদান করা।

দুই. ওলীমার দাওয়াত খাওয়ানো। এটা সুন্নাত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সকল বিবাহে ওলীমার দাওয়াত খাইয়েছেন। ওলীমার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.-কে বলেছেন,

أولم ولو بشاة.

অর্থ : একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমার দাওয়াত খাওয়াও। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫০৭২)

স্মর্তব্য : বিবাহের দু'টি খরচই স্বামীর যিম্মায়– একথার অর্থ এই নয় যে, মেয়ের পিতা মহব্বত করেও মেয়েকে কোন কিছু দিতে পারবে না। আর্থিক সঙ্গতি থাকলে মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে সামর্থ্য অনুযায়ী হাদিয়া-উপঢৌকন দিতে অসুবিধা নেই এবং বিয়ের পরেও আর্থিকভাবে খোঁজ-খবর নিতে কোন মানা নেই।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বীয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাযি.-কে বিবাহকালীন আসবাবপত্র প্রদানের বিষয়টিকে ঢাল বানিয়ে যৌতুককে হালাল করতে চায়। মনে রাখতে হবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে হযরত ফাতেমা রাযি.-এর পিতা ছিলেন, তেমনিভাবে হযরত আলী রাযি.-এরও অভিভাবক ছিলেন। তো সেই জিনিসপত্রগুলো হযরত আলী রাযি.-এর বর্ম-বিক্রিত মূল্য দ্বারা, হযরত আলী রাযি.-এর অভিভাবক হিসেবে নবীজী কিনে বা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন মাত্র। এটা যদি নবীজীর পক্ষ হতে তাঁর টাকা দিয়েই প্রদান করা হতো, তাহলে শুধু হযরত ফাতেমা কেন, সন্তানদের মধ্যে দান-অনুদানের ব্যাপারে সমতা রক্ষা হিসেবে অন্যান্য কন্যাদেরকেও তিনি এসব প্রদান করতেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য কন্যাদের বিবাহ উপলক্ষেও এসব জিনিস প্রদান করেছেন বলে কোন প্রমাণ আমাদের জানা নেই।

সুখময় দাম্পত্য জীবন

শাইখুল হাদীস হযরত মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. বলেন, বিবাহের পর ছেলের পিতা-মাতা মনে করবে, আমাদের একটি মেয়ে বাড়লো। আর মেয়ের পিতা-মাতা মনে করবে, আমাদের একটি ছেলে বাড়লো। আর কোন পিতা-মাতাই তার ছেলে-মেয়ের অকল্যাণ চায় না। সুতরাং তারাও পুত্রবধু/জামাতার অকল্যাণ চাইবে না। বরং কিভাবে তারা শান্তি-সুখে থাকতে পারে সবাই মিলে সেই চেষ্টাই করবে।

অনুরূপভাবে স্বামীও স্ত্রীর হক যথাযথ আদায় করার চেষ্টা করবে, স্ত্রীও স্বামীর হক যথাযথ আদায় করতে সচেষ্ট হবে এবং উভয়ে ছাড় দেয়ার মনমানসিকতা লালন করবে। ভালো গুণগুলোর প্রতি খেয়াল করে খারাপগুলোকে এড়িয়ে যাবে। তাহলে দিন দিন মহব্বত, সাকানা, মাওয়াদ্দাহ ও রহমাহ (ভালোবাসা, সুখ-শান্তি, পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও দয়া-অনুগ্রহ) বৃদ্ধি পাবে।

মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
ইমাম, মসজিদে কুবা, মুহাম্মাদিয়া হাউজিং লি., মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

জরুরী মাসাইল

তারাবীহর বিনিময়

মাওলানা হিশাম

প্রশ্ন : হযরত মুফতিয়ানে কেরামের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, খতম তারাবীহর বিনিময় দেয়া-নেয়া নাজায়েয। কিন্তু হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস নূর আহমাদ সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) তার একটি লিখিত ফতওয়ায় খতম তারাবীহর বিনিময়কে জায়েয বলেছেন। ফতওয়াটি এই–

بسم اللہ الرحمن الرحیم
ختم تراویح کی اجرت کے بارے میں آخری تحقیق۔
واضح ہو کہ عبادات دو قسم کی ہیں۔
(۱) وہ عبادات جو من قبیل المقاصد ہیں والمراد بالمقاصد ما لا يكون فى ضمن شيئ كالصلاة والزكاة. اور زیارت قبور و تلاوت قرآن محض حصول ثواب کیلئے ہوں یعنی تلاوة مجردة كختم القرآن لإيصال الثواب للميت. (الأشباه والنظائر جديد -٦٧)
(۲) وہ عبادات جو من قبیل المقاصد نہیں بلکہ من قبیل الوسائل ہیں المراد بالوسائل مايكون في ضمن سي آخر کالشروط جیسے آذان واقامت وامامت وتلاوت قرآن برائے امر دنیوی مثلا ترقی وشفا وغیرہ کیلئے پڑھی جائے۔ اسی طرح جو دوسری چیز کے ضمن میں پڑھی جائے كقرائة القرآن فى الصلاة یہ تلاوت غیرہ مجردہ ہیں۔
پھر واضح ہو کہ فقہائے متقدمین دونوں قسم کی عبادات پر اجرت کے لین دین دونوں ناجائز بتاتے ہیں۔
اور متاخرین فقہائے فرق کرتے ہیں کہ پہلی قسم عبادات میں اجرت کا لین دین درست نہیں لیکن دوسرے قسم کی عبادات میں اجرت کا لین دین درست ہیں۔
پس امامت پر اجرت کے لین دین درست ہوگا، خواہ فرائض کی امامت ہو، خواہ تراویح کی امامت ہو۔
پھر تراویح کی نماز بعض بعض سورہ کے ذریعہ سے پڑھی جائے، خواہ تمام قرآن مجید کے ذریعہ سے پڑھی جائے۔ پس ختم تراویح کی امامت پر اجرت درست ہوگا۔ لیکن افراط و تفریط نہ ہونا چاہئے امام کی حسب حیثیت ہونا چاہیے۔
والله أعلم وعلمه أتم وأحكم لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
نور احمد عفی عنہ
المفتی والاستاذ
جامعہ اھلیہ دار العلوم معین الاسلام، ہاٹہزاری۔

এখন প্রশ্ন হলো, হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী সাহেব যে ফতওয়া দিয়েছেন, তা দ্বারা কি খতম তারাবীহর বিনিময় নেয়া জায়েয প্রমাণিত হয়? যদি জায়েয প্রামাণিত হয় তাহলে যারা নাজায়েয বলেন তারা কেন নাজায়েয বলেন? আর যদি জায়েয প্রমাণিত না হয় তাহলে হাটহাজারী মাদরাসার প্রধান মুফতী সাহেবের ফতোওয়ার জবাব কী হবে? দলীল-প্রমাণসহ জানালে বাধিত হবো।

নিবেদক
মুহাম্মাদ রেজাউর রহমান
মানিকদি, উত্তরা, ঢাকা

উত্তর : হানাফী মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন সকল উলামায়ে কেরামের মতে খতম তারাবীহ ও সূরা তারাবীহ; উভয়টির বিনিময় দেয়া এবং নেয়া নাজায়েয। সংযুক্ত ফতওয়াটি গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের ফতওয়ার খেলাফ। এ বিষয়ে মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরামের ফতওয়াসহ বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ করা হলো–

মুতাকাদ্দিমীনের ফতওয়া

বান্দা যে কোন ইবাদত করবে চাই তা مقاصد এর অন্তর্ভুক্ত হোক বা وسائل এর অন্তর্ভুক্ত হোক, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের উদ্দেশ্যেই করবে। দুনিয়াবী কোন গরজ ও উদ্দেশ্য তাতে শামিল করলে সেটা নাজায়েয হবে। এ কারণেই নামায, রোযা, তিলাওয়াত, আযান ও ইকামাতসহ সকল ইবাদত (যার দ্বারা শুধু সওয়াব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে) এর বিনিময় গ্রহণ করাকে হানাফী মাযহাবের মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরাম (৪র্থ শতাব্দির পূর্বের উলামায়ে কেরাম) নাজায়েয ফতওয়া দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন, কারো জন্য জায়েয হবে না যে, সে তার সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য অথবা রমাযান মাসে ইমামতির জন্য অথবা আযান দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে কাউকে নিয়োগ দিবে। এমনিভাবে পারিশ্রমিক দিয়ে কাউকে আযান দেয়া, কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং নামাযের জন্য নিয়োগ দেয়াও জায়েয নেই।[১] (মাবসুত ৪/১৫)

এমনিভাবে ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রহ. বলেন, আযান-ইকামতের বিনিময় গ্রহণ করবে না এবং তার জন্য এই বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। কারণ এটি মূলত ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করা। আর তা জায়েয নেই। (বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫২)

বুঝা গেল মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরামের নিকট সকল ইবাদত (مقاصد ও وسائل) এর উপর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। উক্ত হুকুমের মধ্যে ইমামতিও অন্তর্ভুক্ত; চাই ফরযের ইমামতি হোক অথবা তারাবীহর ইমামতি হোক।

মুতাকাদ্দিমীনের ফতওয়ার দলীলসমূহ

নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা ইবাদতের বিনিময় নেয়া নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়–

১. হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে ওসিয়ত করেছেন তা হলো, এমন মুআয্যিন নিয়োগ দিবে, যে আযান দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করবে না।[২] (সুনানে তিরমিযী; হা. নং ২০৯)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিবল রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুরআন পড় এবং তার বিনিময় ভক্ষণ করো না।[৩]... (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ; হা.নং ৭৮২৫)

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কিল রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রমাযান মাসে তারাবীহর ইমামতি করেছেন। অতঃপর ঈদের দিন তার কাছে আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদ একজোড়া কাপড় ও পাঁচশত দেরহাম পাঠান। কিন্তু তিনি তা ফেরত দেন এবং বলেন, আমরা কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করি না।[৪] (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৭৩৯)

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তিলাওয়াত, আযান-ইকামাতসহ সকল ইবাদতের

---

(١)–وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يستأجر الرجل رجلا ليعلم له ولده القرآن أو يستأجر الرجل الرجل يؤمهم في رمضان. و كذالك لا تجوز الإجارة على الأذان ولا على تعليم القرآن و لا على الصلاة. (الاصل للشيباني ١٥/٤)

(٢)– ولا يأخذ على الأذان والإقامة أجرا، ولا يحل له أخذ الأجرة على ذلك؛ لأنه استئجار على الطاعة، وذا لا يجوز (بدائع الصنائع ١٥٢/١)
عن عثمان بن أبي العاص، قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. (سنن الترمذي: ٢٠٩)

(٣)– عن عبد الله بن شبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه» (مصنف ابن ابي شيبه: ٧٨٢٥)

(٤)– عن عبد الله بن معقل: أنه صلى بالناس في شهر رمضان، فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبد الله بن زياد بحلة وبخمسمائة درهم فردها، وقال: «إنا لا نأخذ على القرآن أجرا» (مصنف ابن ابي شيبه: ٧٧٣٩)

উপর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। এ কারণে মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরাম তারাবীহসহ সকল ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করাকে নাজায়েয ফতওয়া দিয়েছেন।

মুতাআখ্‌খিরীনের ফতওয়া

মুতাআখ্‌খিরীন উলামায়ে কেরামের (৪র্থ শতাব্দীর পরবর্তী উলামায়ে কেরাম) নিকটও সকল ইবাদত (وسائل و مقاصد) এর উপর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে وسائل এর মধ্য থেকে শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত কিছু ইবাদত তথা তা'লীম-তাদরীস, আযান-ইকামত ও ইমামতকে مستثنى (ব্যতিক্রম সাব্যস্ত) করেছেন এবং সেগুলোর বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন।

কেননা তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আলেম, মুফতী, ইমাম, মুআয্‌যিন এবং দীনের সকল বিভাগের খাদেমদের জন্য বাইতুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা নির্ধারিত ছিল। যার ফলে তাঁরা জীবিকার ফিকির না করে একনিষ্ঠভাবে দীনের খেদমত করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীর পর যখন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে বদ-দীনী প্রবল হয়ে পড়ে, তখন বাইতুল মাল থেকে তাদের ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে দীনের খেদমত করে বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয নেই। ফলে তাঁরা একাগ্রচিত্তে দীনের খেদমত করতে পারছিলেন না; বরং জীবিকা উপার্জনের পেছনে সময় দিতে তারা বাধ্য হয়ে পড়েন। যার কারণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কিছু শি'আর অর্থাৎ তালীম, ইমামত, আযান-ইকামত মিটে যাওয়ার উপক্রম হলো।

এই সংকটময় পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরে দীনের হেফাযতের স্বার্থে মুতাআখ্‌খিরীন উলামায়ে কেরাম উল্লিখিত নির্দিষ্ট কয়েকটি ইবাদতের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করাকে বৈধ বলেছেন।[1] (তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়া ২/১৩৭)

তারা যে কয়েকটি ইবাদতের উপর বিনিময় গ্রহণ করাকে জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন সেগুলো ছাড়া অন্য সকল ইবাদতের মধ্যে পূর্বের হুকুম (বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়া) বহাল থাকবে।

আল্লাম শামী রহ. বলেন, আমাদের ইমামগণ শুধু ঐ সকল ইবাদতকে مستثنى (ব্যতিক্রম সাব্যস্ত) করেছেন যেগুলোকে দীনের হেফাজত ও দীনের শি'আর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তালীম, আযান ও ইমামত।[2] (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ১/১৮৪)

তিনি অন্যত্র বলেন, তা'লীম, তাদরীস, আযান ও ইমামতের উপর বিনিময় গ্রহণ করার ইল্লত (কার্যকারণ) হলো (দীনের হেফাজতের) প্রয়োজন। এই হুকুম এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অন্য যে সকল বিষয়ের মধ্যে এই ইল্লত পাওয়া যায় না তা এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[3] (রাসাইলে ইবনে আবেদীন ১/১৬১)

সুতরাং উল্লিখিত কয়েকটি ইবাদত ছাড়া অন্য কোন ইবাদতের উপর বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

তারাবীহ প্রসঙ্গ

হযরত উমর রাযি.-এর যামানা থেকে খতম তারাবীহ নিয়মিত জামাআতের সাথে পড়া শুরু হয়। তখন থেকেই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা খতম তারাবীহর ইমামতি করতেন তারা বিনিময় দিলেও গ্রহণ করতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কিল. থেকে বর্ণিত যে, তিনি রমাযান মাসে তারাবীহ নামাযের ইমামতি করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাকে একজোড়া কাপড় ও পাঁচশত দিরহাম পাঠিয়ে দেন। তিনি গ্রহণ না করে বলেন, আমরা কুরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ করি না।[4] (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা; হা.নং ৭৭৩৯)

উক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে صلوة في رمضان এর কথা বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা তারাবীহর নামায উদ্দেশ্য। এ অর্থ ঐ সকল হাদীস থেকে খুব সহজেই বুঝে আসে, যে সকল হাদীসে صلوة في رمضان এর مصداق (প্রয়োগক্ষেত্র) তারাবীহ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

كان ابى بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث

অর্থ : উবাই ইবনে কা'ব রাযি. রমাযান মাসে মদীনায় বিশ রাকআত তারাবীহ ও তিন রাকআত বিতর নামাযের ইমামতি করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৬৮৪)

عن ابي الحسناء ان عليا امر رجلا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة

অর্থ : আবুল হাসানা থেকে বর্ণিত যে, আলী রাযি. জনৈক ব্যক্তিকে রমাযান মাসে বিশ রাকআত তারাবীহর ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৫/২২৩)

যেহেতু উল্লিখিত হাদীস দুটিতে صلوة في رمضان দ্বারা তারাবীহ উদ্দেশ্য। এতএব আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতেও صلوة في رمضان দ্বারা তারাবীহ উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কিল রাযি.-এর উক্তি "إنا لا نأخذ على القرآنأجرا" দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা যুগে যারা তারাবীহর ইমামতি করতেন তারা খতম তারাবীহর বিনিময় গ্রহণ করতেন না। আর গ্রহণ করাকে জায়েযও মনে করতেন না।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ইমাম আহমাদ রহ.-কে একজন ইমাম সাহেব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যিনি মুসল্লীদেরকে বলেছেন, আমি রমাযানে তারাবীহ পড়াবো এত এত দিরহামের বিনিময়ে। তিনি তার জবাবে বললেন, আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কে এই ব্যক্তির পিছনে নামায পড়বে?[5] (মুখতাসারু কিয়ামিল্লাইলি... :১/২৪৬)

তাছাড়া সকল ইবাদতের মধ্যে কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতও একটি বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য ইবাদত এবং ইবাদতে মাকসূদার অন্তর্ভুক্ত। চাই তা নামাযে পড়া হোক বা নামাযের বাইরে, নিজে সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে পড়া হোক বা অন্যকে সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে, তা'লীমের উদ্দেশ্যে পড়া হোক

---

(١)‾ واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن فجوزوا الاستئجار عليه وعللوا ذلك في شروح الهداية وغيرها بما مر وبالضرورة وهي خوف ضياع القرآن؛ لأنه حيث انقطعت العطايا من بيت المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسبة يشتغل المعلمون بمعاشهم ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الأذان والإمامة للعلة المذكورة؛ لأنهما من شعائر الدين ففي تفويتهما هدم الدين فهذه الثلاثة مستثناة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات (تنقيح الفتاوى الحامدية: ١٣٧/٢)

(٢)- فعلم ان ائمتنا لم يستثنوا من الطاعات الا ما نصوا من التعليم والاذان والامامة مما فيه ضرورة داعية و هي حفظ الدين واقامة شعائرة للموحدين الخ(رسائل ابن عابدين: ١٥٧/١)

(٣)- يظهر لك ان العلة في جواز الاستئجار على تعليم القرآءة و الفقه والاذان والامامة هي الضرورة واحتياج الناس الى ذلك وان هذا مقصور على هذه الاشياء دون ما عداها مما لا ضرورة الى الاستئجار عليه(رسائل ابن عابدين: ١٦١/١)

(٤)- عن عبد الله بن مغفل أنه صلى بالناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث إليه عبد اللهبن زياد بحلة وبخمسمائة درهم فردها وقال إنا لا نأخذ على القرآن أجرا(مصنف ابن ابي شيبة: ٧٧٣٩)

(٥)- وَسُئِلَ أَحْمَدُ , عَنْ إِمَامٍ قَالَ لِقَوْمٍ أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا , قَالَ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا؟ (مختصر قيام الليل وقيام رمضان: ٢٤٦/١)

বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে– সর্বাবস্থায় কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত একটি বিশেষ ইবাদত। সুতরাং অন্য সকল ইবাদতের মতো তিলাওয়াতের উপরও বিনিময় নেয়া নাজায়েয হবে। তবে তিলাওয়াত শুধুমাত্র তা'লীমের উদ্দেশ্যে হলে মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরামের ফতওয়া অনুযায়ী বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে।

আল্লামা শামী রহ. বলেন,

ولا شك أن التلاوة المجردة عن التعليم من أعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستئجار عليها ؛ لأن الاستئجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب... فهذه نصوص المذهب من متون وشروح وفتاوى متفقة على بطلان الاستئجار على الطاعات ومنها التلاوة كما سمعت إلا ما استثناه المتأخرون للضرورة كالتعليم والأذان والإمامة ولا يصح إلحاق التلاوة المجردة بالتعليم لعدم الضرورة إذ لا ضرورة داعية إلى الاستئجار عليها بخلاف التعليم

অর্থ : নিশ্চয় তা'লীম ভিন্ন সকল তিলাওয়াত ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা সওয়াব উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং তার উপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কেননা বিনিময় নেয়ার অর্থ হলো মানাফে' বিক্রি করা। আর তিলাওয়াতকারীর মানফাআত (লাভ) শুধুমাত্র সওয়াব। (এ ছাড়া আর কিছু নয়) আর সওয়াব বিক্রি করা জায়েয নেই।... (তানক্বীহুল ফাতাওয়াল হামেদিয়াহ ২/১৩৭, ১৩৮)

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝে আসে যে, তা'লীম ব্যতীত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের উপর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। কেননা আল্লামা শামী রহ. عن التعليم বলে বুঝিয়ে দিলেন যে, ফুকাহায়ে কেরাম التلاوة المجردة বলে শুধুমাত্র তা'লীমের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতকে খারিজ করেন। সুতরাং নামাযের মধ্যে যে তিলাওয়াত হয়, সেটাও التلاوة المجردة এর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাকে 'তিলাওয়াতে গায়রে মুজার্‌রাদাহ' বলার কোন সুযোগ নেই।

অতএব যদিও তারাবীহর মধ্যে খতমে কুরআনের বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু উল্লেখিত হুকুমের ব্যাপকতার মধ্যে তারাবীহও শামিল হয়ে যাবে। এ জন্যই হযরত থানবী রহ. আল্লামা শামী রহ.-এর নিম্নে বর্ণিত বক্তব্য নকল করে তার ব্যাখ্যা এভাবে করেন,

وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز ، ثم استثنوا بعده ما علمته ، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع ، فإن مفاهيم الكتب حجة ولو مفهوم لقب على ما صرح به الأصوليون بل هو منطوق ، فإن الاستثناء من أدوات العموم كما صرحوا به أيضا(رد المحتار:٦/٣٤٠)

عبارت ہذا سے معلوم ہوا کہ ختم فی التروایح کی تصریح بہ خصوصیت نہ پایا جانا (اگر مسلم ہو) مضر حکم حرمۃ استیجار نہیں، کیونکہ اولا مفہوم مخالف روایات فقہیہ میں حجت ہے، ...بوجہ عموم صدر کلام کے ماسوی ا ... ی کو اس ختم علی الاجرۃ کی حرمۃ منطوق و منصوص ہے، چنانچہ عبارت مذکورہ آنفا اس پر دال ہے۔

অর্থ : খতম তারাবীহর মধ্যে বিনিময় নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি (উল্লিখিত বক্তব্যে) বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকলেও তা নাজায়েযই হবে। কেননা প্রথমত ফিকহী রেওয়াতের মধ্যে "মাফহুমে মুখালেফ" দলীল হয়ে থাকে। তাছাড়া বাক্যের শুরু অর্থাৎ مستثنى منه-এর ব্যাপকতার কারণে (বাকী সব কিছুর মত) বিনিময় নিয়ে খতম পড়া নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি (منصوص ও منطوق) বলে বিবেচিত হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৭৬)

এমনিভাবে আব্দুল হাই লাখনভী রহ. তার "উমদাতুর রিআয়াহ" নামক গ্রন্থে তারাবীহর হুকুম স্পষ্ট উল্লেখ করে বলেছেন,

فتفكر وتدبر ليظهر عليك قوةدليل عدم جواز الاستئجار على قرائة القرآن لاتصال الثواب الى الميت سواء كان على القبر اولا والاستئجار على ختم القرآن في التراويح كما اعتاده الحفاظ في زماننا فاهم يعينون الاجر من قبل

অর্থ : তুমি চিন্তা ফিকির করো, যেন তোমার কাছে ... তারাবীহর মধ্যে খতমে কুরআনের উপর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার দলীলের মজবুতি স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন- বর্তমান যামানায় হাফেযগণ তা গ্রহণ করে অভ্যস্ত; তারা পূর্ব থেকেই বিনিময় নির্ধারণ করে নেয়।... (উমদাতুর রিআয়াহ ৬/৫৬২)

এমনিভাবে হযরত থানবী রহ. "ইমদাদুল ফতওয়া"র মধ্যে আল্লামা শামী রহ.-এর একটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলেন,

"لا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر اوغيره".

اس" غیرہ "کے لفظ میں غیر قراءۃ علی القبر بھی داخل ہے جو تراویح کو بھی شامل ہے،

অর্থ : غیرہ শব্দের মধ্যে কবরে তিলাওয়াত ছাড়া অন্য তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে তারাবীহও শামিল হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮১)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন সকল হানাফী উলামায়ে কেরামের মতে খতম তারাবীহর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয।

এছাড়া আমাদের সকল আকাবিরের ফতওয়াও এটাই যে, খতম তারাবীহর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। নিম্নে তাদের ফতওয়ার শুধু সূত্রসমূহ পেশ করা হলো-

১. ফাতাওয়া আযীযী (শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ.) পৃষ্ঠা ৪৯০

২. ফাতাওয়া রশীদিয়া (ফকীহুল আসর রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.) পৃষ্ঠা ৩৭৭

৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া (হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ.) ১/৪৭১-৪৮৫

৪. ফাতাওয়া খলীলিয়া (রঈসুল ফুকাহা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.) পৃষ্ঠা ৪৮

৫. ইমদাদুল মুফতীন (মুফতীয়ে আযম মুহাম্মাদ শফী রহ.) পৃষ্ঠা ৩১৩

৬. আহসানুল ফাতাওয়া (মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.) ৩/৫১৪

৭. ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৪/২৪৬

৮. ফাতাওয়া মাহমূদিয়া (মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.) ১১/৪০৩

৯. আযীযুল ফাতাওয়া (মুফতী আযীযুর রহমান রহ.) পৃষ্ঠা ৬৬৩

১০. ফাতাওয়া রহীমিয়া (মুফতী সাইয়িদ আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ.) ৬/২৫৬

সুতরাং খতম তারাবীহ পড়ে বিনিময় আদান-প্রদান নাজায়েয। বরং বিনিময় না নিয়ে খতম তারাবীহ পড়ানোর মত কোন হাফেয না পাওয়া গেলে নিয়মিত ইমামের পিছনে সূরা তারাবীহ পড়বে। কেননা তারাবীহর মধ্যে কুরআনে কারীমের খতম করাকে যদিও অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম সুন্নাতে মুআক্কাদা বলেছেন; (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৫০০) কিন্তু মুতাআখ্খিরীন হানাফী উলামায়ে কেরাম একথাও বলেছেন যে, যদি খতম পড়লে মুসল্লীদের কষ্ট হয় তাহলে সূরা তারাবীহও পড়তে পারবে। সুতরাং যখন মুসল্লী কমে যাওয়ার আশঙ্কায় খতমের সুন্নাতকে ছেড়ে দেয়ার বৈধতা পাওয়া গেল, তখন ইবাদতের উপর বিনিময় নেয়া (যা নাজায়েয) থেকে বিরত থাকার জন্য খতমের সুন্নাতকে ছাড়া বৈধ হবে না কেন? যখন কোন ভালো কাজ করতে

গেলে খারাপ কাজে লিপ্ত হতে হয়, সেক্ষেত্রে শরীয়তের সিদ্ধান্ত হলো, সেই ভালো কাজকে ছেড়ে দিতে হবে।

আল্লামা শামী রহ. বলেন,

قال الشامي: إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا على فعل البدعة(حاشية ابن عابدين:١/٦٤٢)

অতএব যখন সেই সুন্নাত আদায় করতে গেলে একটি নাজায়েয কাজে লিপ্ত হতে হয়, তখন সেই সুন্নাতকেই ছেড়ে দিতে হবে।

সূরা তারাবীহর ইমামতির বিনিময় গ্রহণ প্রসঙ্গ

মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম যে সকল ইবাদতকে مستثنى (ব্যতিক্রম সাব্যস্ত) করে সেগুলোর বিনিময় গ্রহণ করাকে জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ইমামতি। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতি। সূরা তারাবীহর ইমামতি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন জানাযা ও দুই ঈদের নামাযের ইমামতি এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব কেউ কেউ সূরা তারাবীহর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয প্রমাণিত করার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট খতম তারাবীহর ইমামতির মত সূরা তারাবীহর ইমামতির বিনিময়ও গ্রহণ করা নাজায়েয। কেননা মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম কিছু ইবাদতকে مستثنى করার যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা হলো দীন ও শরীয়তের শি'আরকে প্রতিষ্ঠিত করা। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাআতের সাথে পড়া ওয়াজিব এবং শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারাবীহর নামায জামাআতের সাথে পড়া অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের নিকট সুন্নাতে কেফায়া। এক মহল্লায় একটি জামাআত হলেই সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

আল্লামা শামী রহ. বলেন, সুন্নাত দুই প্রকার- ১. সুন্নাতে আইন ২. সুন্নাতে কিফায়া। উভয়টির উদাহরণ হলো, তারাবীহর নামায সুন্নাতে আইন আর প্রত্যেক মহল্লায় তা জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে কিফায়া।[১] (ফাতাওয়া শামী ১/৫৩৮)

এ বিষয়ে আকাবিরদের অভিমত উল্লেখ করা হলো-

১. মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়ায় স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম যে ইমামতকে مستثنى করেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি।[২] (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৭/৬১; সলিমুল্লাহ খান সাহেবের টীকা সম্বলিত)

২. মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী রহ. ইমদাদুল আহকামের মধ্যে বলেন, শুধু তারাবীহর ইমামতির বিনিময় গ্রহণ করা উল্লিখিত ঐ প্রয়োজনটি না পাওয়া যাওয়ার কারণে জায়েয নেই, যার ভিত্তিতে তালীমে কুরআন, ফরয নামাযের ইমামতি, আযান ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হয়েছে। কেননা এসকল ইবাদত হয়তো ফরয অথবা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, যা শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত। আর তারাবীহর ইমামতি সুন্নতে কিফায়া। ... কিন্তু ফরযের জামাআত ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। তাছাড়া এটি শি'আরে ইসলাম। সুতরাং তার মধ্যে উক্ত প্রয়োজন পাওয়া যায়, যা তারাবীহর মধ্যে পাওয়া যায় না। অতএব শুধু তারাবীহর ইমামতির বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই এবং তারাবীহতে কুরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয নেই।[৩] (ইমদাদুল আহকাম ৩/৫৭৭)

৩. মুফতী আযীযুর রহমান রহ. বলেন, ওয়াজ করে বিনিময় গ্রহণ করাকে মুতাআখ্খিরীন হানাফী উলামায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন। ... তাছাড়া কুরআন পড়া, জানাযা, ঈদ ও তারাবীহর নামাযের ইমামতির বিনিময় নেয়া জায়েয নেই। (ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/৩০৮)

৪. মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে এভাবে ফতওয়া দেয়া হয়েছে– 'মোটকথা মুতাআখ্খিরীন হানাফী উলামায়ে কেরাম যে ইমামতির বিনিময়কে জায়েয বলেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতি। দুই ঈদ, জানাযা ও তারাবীহর ইমামতি উল্লিখিত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (বিস্তারিত দেখুন معاوضه على التراويح كي شرعي حيثيت; পৃষ্ঠা ২০)

আকাবিরদের এ সকল ফতওয়া থেকে খুব সহজেই বুঝে আসে যে, তারাবীহর বিনিময় নাজায়েয হওয়ার মুল কারণ শুধু মাত্র খতমে কুরআন নয়। বরং শুধু তারাবীহর ইমামতি হওয়াটাও বিনিময় নাজায়েয হওয়ার একটি উল্লখযোগ্য কারণ। অতএব সূরা তারাবীহর ইমামতির বিনিময়কে জায়েয বলার কোন সুযোগ নেই।

মোটকথা তারাবীহর ইমামতি করে ইমাম সাহেবের জন্য কোনভাবেই বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। হাফেজ সাহেবদের জন্য উচিৎ, মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর পবিত্র কালাম কুরআন মাজীদ-এর মত মহাদৌলত হিফয করার জন্য তাদেরকে কবুল করেছেন এর শুকরিয়া স্বরূপ শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই রাজী ও খুশি করার উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করে মুসল্লীদেরকে শুনাবেন। আর মুসল্লীদের কাছ থেকে এর অবৈধ বিনিময় গ্রহণ করবেন না; বরং এর প্রতিদান আল্লাহ তা'আলার কাছে পাওয়ার আশা রাখবেন। তিনিই হাফেয সাহেবদেরকে উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।

তবে হাফেয সাহেবদেরকে প্রশস্ততার সাথে উপযুক্ত যাতায়াত খরচ ও খানা বাবদ খরচ দিতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ কেউ যদি ব্যক্তিগত মুহাব্বতের কারণে খতমের দিন ব্যতীত আগে পরে অন্য কোন দিন চাঁদা তোলা ব্যতীত একান্ত নিজস্বভাবে হাফেজ সাহেবদেরকে হাদিয়া দেন তাহলে এতেও কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত ফতওয়ার কিছু পর্যালোচনা

সংযুক্ত ফতওয়ায় وسائل এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম তার বিনিময় গ্রহণ করাকে জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন। অথচ মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম থেকে সকল وسائل এর ব্যাপারে এমন কথা প্রমাণিত নয়। সুতরাং তাদের ব্যাপারে এমন কথা বলা তাদের উপর অপবাদ আরোপের নামান্তর। কেননা তাদের থেকে এর খেলাফ নুসূস পাওয়া যায়।

যেমন- আল্লামা শামী রহ. বলেন, 'হিদায়া, কানয, মাজমা', আল মুখতার ও বেকায়া গ্রন্থের মুসান্নিফগণ ইবাদতের উপর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয হওয়ার

(١)_وفيه إشارة إلى أن السنة قد تكون سنة عين وسنة كفاية؛ ومثالهما قالوا في صلاة التراويح إنها سنة عين وصلاتها بجماعة في كل محلة سنة كفاية (حاشية ابن عابدين:١/٥٣٨)

(٢)-اصل یہ ہے کہ عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں، لیکن متاخرین نے بعض عبادات کو مستثنی کیا ان میں امامت نماز پنجوقتہ بھی ہے،(فتاوی محمودیہ:١٧/٦١)

(٣)–فإمامة التراويح بمجردها لا يجوز أخذ الأجرة عليها لعدم الضرورة التي بهاأبيح الأجرة في تعليم القرآن و إمامة المكتوبة والأذان و غيرها فانها فرائض او سنن مؤكدة من شعائر الاسلا م وامامة التراويح سنة كفاية وتتأتى بقرائة سورة قصيرة من آخر القرآن لا تتوقف على الختم ... بخلاف جماعة المكتوبات فانها واجبة على العين او سنة مؤكدة أيضا فانها من الشعائر فتحققت الضرورة فيها دون جماعة التراويح فلا يجوز أخذ الأجرة على امامتها مجردة ولا على الختم فيها(امداد الأحكام:٣/٥٧٧)

বিষয়টি কিতাবুল ইজারায় উল্লেখ করেছেন। অতপর তা'লীমে কুরআনকে তার থেকে مستثنى করেছেন। অন্যরা তা'লীমে ফিকহ, ইমামত, আযান ও ইকামতকেও مستثنى করেছেন। ... এটা একথার অত্যন্ত মজবুত দলীল যে, মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম যে ফতওয়া দিয়েছেন তা সকল ইবাদতের ব্যাপারে নয়; বরং তা ঐ সকল বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট, যেগুলোকে তারা প্রয়োজনের খাতিরে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।'[১] (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ১/১৬৩)

সংযুক্ত ফতওয়ায় বলা হয়েছে, 'নামাযের মধ্যে যে তিলাওয়াত করা হয় তা তিলাওয়াতে গায়রে মুজাররাদাহ-এর অন্তর্ভুক্ত'। এর দ্বারা মুফতী সাহেব সম্ভবত এদিকে ইশারা করতে চেয়েছেন যে, ফুকাহায়ে কেরাম তিলাওয়াতে মুজার্‌রাদাহ-এর উপর বিনিময় গ্রহণ করাকে নাজায়েয ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু নামাযের তিলাওয়াত তাতে দাখিল না হওয়ার কারণে সেই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কিন্তু 'তানকীহুল ফাতাওয়া'র ইবারত যা আমরা পূর্বেই নকল করে একথা বুঝিয়েছি যে, التلاوة المجردة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তালীম ছাড়া অন্য যে কোন তিলাওয়াত।

সুতরাং নামাযের তিলাওয়াতকে তিলাওয়াতে গাইরে মুজার্‌রাদাহ বলে তার বিনিময় গ্রহণ করাকে জায়েয বলার কোন সুযোগ নেই।

সংযুক্ত ফতওয়ায় বলা হয়েছে যে, 'ইমামতি وسائل হওয়ার কারণে তার বিনিময় নেয়া জায়েয আছে। চাই ফরযের ইমামতি হোক বা তারাবীহর ইমামতি হোক, চাই সূরা তারাবীহর ইমামতি হোক বা খতম তারাবীহর ইমামতি হোক। অতএব খতম তারাবীহর বিনিময় নেয়া জায়েয হবে।'

কিন্তু এভাবে খতম তারাবীহর ইমামতির বিনিময় জায়েয প্রমাণিত হয় না। কেননা প্রথমত: পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আকাবির উলামায়ে কেরাম ও দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুতাআখ্খিরীন ফুকাহায়ে কেরাম প্রয়োজনের খাতিরে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতির বিনিময়কে জায়েয বলেছেন। এছাড়া অন্য সকল নামাযের ইমামতির বিনিময় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পূর্বের হুকুমই বহাল আছে। অতএব ঢালাওভাবে সব ধরনের ইমামতির বিনিময় গ্রহণ করাকে জায়েয বলা সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত: এটি মূলত ইমামতির উসিলা দিয়ে কুরআন খতমের বিনিময় নেয়ার একটি বাহানা মাত্র। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কায়েদা الأمور بمقاصدها এর ভিত্তিতে উক্ত حيلة (বাহানা) এর উপর আমল করা জায়েয হবে না। কেননা যদিও টাকা দেয়া হবে ইমামতির বেতন বলে কিন্তু মূলত খতমের বিনিময় দেয়াই উদ্দেশ্য। অতএব তা জায়েয হবে না। এবিষয়ে হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. ইমদাদুল ফতওয়ায় বলেন, এই (তারাবীহর) খতমকে ইমামতির অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা এবং সেই ভিত্তিতে তাকে ভিন্ন মনে করা ভ্রান্ত ধারণা। কেননা খতমকে ইমামতও বলা যায় না এবং তার মওকুফ আলাইহি অংশ বা তার সাথে সম্পৃক্ত কোন লাযেম বিষয়ও বলা যায় না। কেননা ইমামতি খতম ছাড়াও সম্ভব।[২] (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৭৯)

তিনি অন্যত্র এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

প্রশ্ন : যদি যায়েদকে কোন ব্যক্তি বিনিময় নির্ধারণ করা ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ করে কিছু টাকা দেয় অথবা এক মাসের জন্য ইমাম হিসাবে নিয়োগ দিয়ে কিছু বেতন দেয় তাহলে তা হালাল হবে কি? ইমামতির সূরতে হালাল হওয়ার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই। কেননা মুতাআখ্খিরীন উলামায়ে কেরাম ইমামতির বেতনকে জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : জায়েয হওয়ার এই ফতওয়া ঐ সময় প্রযোজ্য হবে যখন শুধু ইমামতি উদ্দেশ্য হবে। অথচ এখানে উদ্দেশ্য তারাবীহর মধ্যে খতম করা। ইমামতি তো শুধু একটি বাহানা মাত্র। 'দিয়ানাত- এর ক্ষেত্রে হিলা দ্বারা কোন নাজায়েয জিনিস হালাল হয় না।[৩] (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৪-৪৮৫)

হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.এর উক্ত ফতওয়ার হাশিয়ায় সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা. বলেন, '(হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ) কায়েদা আছে الامور بمقاصدها সুতরাং যদি কোন হাফেযকে খতমে কুরআনের জন্য তারাবীহর ইমাম বানানো হয় তাহলে এখানে বাস্তবে ইমামতি উদ্দেশ্য হয় না। বরং কুরআন শরীফের খতমই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। (ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪/২৭৩) কিন্তু মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব এই হিলাকে জায়েয বলেছেন। তিনি বলেন, 'যদি রমাযান মাসের জন্য হাফেযকে বেতন দিয়ে রাখা হয় এবং তার যিম্মায় এক/দুই ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতি নির্ধারণ করে দেয়া হয় তাহলে তা জায়েয হবে। কেননা ইমামতির বেতনকে ফুকাহায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন'। কিন্তু এটা শুধু একটি হিলা মাত্র। মূল উদ্দেশ্য কুরআনে কারীম খতম করাই। ইমামতি কখনই উদ্দেশ্য নয়। আর দিয়ানতের মধ্যে হিলা দ্বারা কোন জিনিস হালাল হয় না। অতএব হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. যে জবাব দিয়েছেন সেটাই সঠিক।'[৪] (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪৮৫)

মোটকথা, সংযুক্ত ফতওয়ায় খতম তারাবীহকে সাধারণ ইমামতির অন্তর্ভুক্ত করে মুতাআখ্খিরীনদের মাযহাব অনুযায়ী তার বিনিময়কে জায়েয প্রমাণিত করার চেষ্টা করা হলেও, স্বয়ং মুতাআখ্খিরীন ও আমাদের আকাবিরদের থেকে তার খেলাফ ফতওয়া বিদ্যমান থাকার কারণে খতম তারাবীহর বিনিময়কে জায়েয বলার কোন সুযোগ নেই।

উল্লেখ্য, উর্দূ ভাষায় লিখিত সংযুক্ত ফতওয়াটিতে হাটহাজারী মাদরাসার কিংবা হাটহাজারী মাদরাসার ফাতাওয়া বিভাগের কোন সিলমোহর নেই। মুফতী নূর আহমাদ সাহেবের নিজস্ব সিল এবং অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সিল আছে। এতে বোঝা যায়, সম্ভবত এটি মুফতী সাহেবের নিজস্ব মত, হাটহাজারী মাদরাসা কিংবা হাটহাজারী মাদরাসার ফাতাওয়া বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক ফতওয়া নয় এবং আমাদের জানামতে এ ব্যাপারে হাটহাজারীর ফাতাওয়া বিভাগের অবস্থানও তা-ই যেটা আমরা প্রমাণ করেছি।

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ; জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

---

(١)–ممن صرح بذلك صاحب الهداية و الكنز والمجمع والمختار و الوقاية وغيرهم نصوا على ذلك في كتاب الاجارة ثم اسبثنوا بعليم القرآن من الطاعاتو بعضهم استثنى ايضا تعليم الفقه و الامامة والاذان و الاقامة كما علمت ذلك مما نقلنا ه عن المتون غيرها وهذا من اقوى الادلة على ما قلنا من ان ما افتوا به ليس عاما في كل طاعة بل هوخاص بما نثوا عليه مما وجد فيه علةالضرورة والاحتياج الخ(رسائل ابن عابدين: ١٦٣/١)

(۲)–اسی طرح اس ختم کو باب امامت میں داخل کرنے کا دعوی اور اس بناء پر اسکو مستثنی سمجھنا محض باطل ہے، کیونکہ ختم نہ عین امامت ہے نہ اسکا موقوف علیہ جزئیۃً یا لزوماً ہے۔ کیونکہ امامت بلا ختم بھی متحقق ہوتی ہے۔(امداد الفتاوی: ۱/۴۷۹)

(۳)– سوال: اگر زید کو کوئی شخص بغیر اجرت طے کئے ہوئے اپنی خوشی سے دس پانچ روپے دیوے یا ایک ماہ کے لئے امام مقرر کر کے کچھ اجرت دیوے اس طور سے عند الشرع اجرت حلال ہوگی یا نہیں اور امامت کی صورت میں تو حلال ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ علماء متاخرین نے امامت کی اجرت پر فتوی دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تفصیل وار تحریر کیجئے۔

الجواب: یہ جواز کا فتوی اس وقت ہے جب امامت ہی مقصود ہو، حالانکہ یہاں مقصود ختم تراویح ہے اور یہ محض ایک حیلہ دیانات میں جو کہ معاملہ فی مابین العبد و بین اللہ ہے۔ حیل مفید جواز واقعی کو نہیں ہوتے، لہذا یہ ناجائز ہوگا۔(امداد الفتاوی: ۱/۴۸۴-۴۸۵)۔

(٤)– قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا پس اگر کسی حافظ کو ختم قرآن شریف کے لئے تراویح کا امام بنایا جاوے تو ظاہر ہے کہ اس سے مقصود امامت نہیں ہے بلکہ قرآن شریف کا ختم ہے (فتاوی دار العلوم جدید: ۴/۲۷۳) لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اس حیلہ کے جواز کا فتوی دیا ہے، فرماتے ہیں، "اگر رمضان المبارک کے مہینہ کے لئے حافظ کو تنخواہ پر رکھ کیا جائے اور ایک دو نمازوں میں اس کی امامت معین کر دی جائے تو یہ صورت جواز کی ہے، کیونکہ امامت کو اجرت (تنخواہ) کی فقہاء نے اجازت کی ہے" (کفایت المفتی، جلد دوم ص: ۵) لیکن ظاہر ہے کہ یہ حیلہ ہی حیلہ ہے، مقصود واقعی ختم قرآن شریف ہے، امامت مقصود ہر گز نہیں ہے اور دیانات میں حیلے مفید نہیں ہوتے فالحق ما افتی بہ المجیب قدس سرہ العزیز۔ ۱۲ سعید احمد

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-২০

দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে তিনি চিরবিদায় নিলেন। সেই সাথে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গেলেন এক এতীম সন্তানকে এবং এতীম-জননীকে। ভাইজান বড় নীরব মানুষ ছিলেন। সরকারি চাকরী করতেন। দু'টি ছেলে-সন্তানের পিতা। বড়টা পড়ালেখা শেষ করে চাকরিতে যোগদান করেছে। ছোটটা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য সে দু'আ চাইতে গিয়েছিলো রাজারবাগের পীর দিল্লুর রহমানের কাছে। রাজারবাগী একজন দক্ষ শিকারী। সে ছেলেটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের মুরীদ বানিয়ে নিয়েছে। ছেলের পড়ালেখা এখানেই শেষ। সে এখন সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি, সাদা গোল জামা ও পাগড়ী পরে। সারাক্ষণ পীরের আস্তানায়ই পড়ে থাকে। এখন সে পীরের একজন ঘনিষ্ঠ খাদেম। নাওয়া-খাওয়া ঐ আস্তানাতেই। বাবা-মায়ের কাছ থেকে কোন খরচপাতি নেয় না। তেমন একটা দেখা-সাক্ষাতও করতে আসে না। মাঝে-মধ্যে আসলে বাবা-মাকেও পীরের মুরীদ হয়ে যেতে বলে, তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে বলে। বাবা-মায়ের সাথে এমন দূরত্ব রেখে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলে, আমি তোমাদের জন্য হুযূর কেবলার ওখানে বসে দু'আ করতে থাকি, আমার দু'আর বদৌলতেই না তোমরা বেঁচে আছো। বিবাহ-শাদী, কামাই-রোজগার এবং ভবিষ্যতের কথা বললে বিরক্তি প্রকাশ করে এবং দুনিয়া-বিরাগী হওয়ার বিষয়ে কিছু ওয়ায শুনিয়ে দেয়। বাবা এ বিষয় মাঝে-মধ্যে আমার কাছে শেয়ার করেন। আফসোস করে বলেন, এ কেমন পীর, যার মুরীদ হলে সন্তান বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে যায়! ছেলের মুখে পীরের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা শুনি তাতে তো মনে হয় এরা তাদের পীরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও উর্ধ্বে মনে করে। ছেলেটা যে কেন এমন পথভ্রষ্ট হয়ে গেলো, এর কোন কারণই বুঝে আসে না। মোটকথা ছেলেটা এখন তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। এ নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

এরই মধ্যে একদিন সংবাদ পেলাম, ভাইজান খুব অসুস্থ; হার্টের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, সুস্থতার জন্য লোক মারফত দু'আ চেয়েছেন। আমরা তার সহজ ও সফল চিকিৎসার জন্য দু'আ করলাম। কয়েকদিন পর তিনি বাসায় ফিরলেন। খবর পাঠালেন, সম্ভব হলে বাসায় গিয়ে যেন একটু সাক্ষাত করি। এক প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে তাকে দেখতে গেলাম। হার্টে দু'টো রিং পরানো হয়েছে। এনজিওগ্রামের ব্যান্ডেজগুলো এখনো শরীরে বহাল আছে। আমাদের পাশে এসে বসতে বসতে বললেন, হুযূর! আপনাদের দু'আয় এখন অনেকটা আরামবোধ করছি। রিং পরানোর আগে মনে হতো, বুকটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। দু'আ করবেন, যেন পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই। এরপর গরম গরম টিকিয়া কাবাব দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বললেন, এগুলো আপনাদের জন্য বাসায় বানানো হয়েছে। এ আপ্যায়নে আমার চেয়েও বেশি মুগ্ধ হলেন আমার ভোজনরসিক সঙ্গী, যদিও ডাক্তারী মতে ভাজা-পোড়া তার জন্য মোটেও সমীচীন নয়। আপ্যায়নের পর ভাই-ভাবী দু'জনের জন্য দু'আ করে আমরা উঠে পড়লাম।

ভাইজান ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। বড় ছেলেকে বিয়েও করালেন। ছেলের বউ থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। তারা পারিবারিকভাবে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। কাগজপত্র তৈরি হতেই যা দেরি, এরপর ছেলেও অস্ট্রেলিয়া চলে গেল। এখন বাসার শুধু ভাই আর ভাবী।

কিছুদিন পর কোথাও যাওয়ার জন্য লেগুনায় উঠলাম। আমার উঠে বসার পরপরই ভাই-ভাবীও লেগুনায় উঠলেন। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর! কোথায় যাচ্ছেন? আমি জবাব দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথায় যাবেন? বললেন, সি.এম.এইচে (ক্যান্টনমেন্ট সেনা হাসপাতালে) আপনার ভাবীর ডায়ালোসিস করাতে। তার দু'টো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। সপ্তাহে তিনবার ডায়ালোসিস করাতে হয়, একটা করে ইঞ্জেকশন নিতে হয়। খরচ আর শ্রম দু'টো মিলিয়ে আর কুলাতে পারছি না। জীবনে কেন যে এতো পরীক্ষা বুঝতে পারছি না। লেগুনায় যাত্রীসাধারণের সামনে আর কথা এগোলো না। বললেন, হুযূর! এ ব্যাপারে পরে কথা বলবো...

পরে একদিন মসজিদে দেখা হলে দুঃখ ও কষ্টের কাহিনী সবিস্তারে বলতে লাগলেন। বললেন, আপনারা জানেন, আমি একজন হার্টের রোগী। তা সত্ত্বেও সপ্তাহের বেশির ভাগ সময় আপনার ভাবীকে ধরে ধরে বাথরুমে আনা-নেয়া করতে হয় আমাকেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছি। সে টাকা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে তার সুদ দিয়ে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করছি। অফিসও ঠিকমতো করতে পারছি না। কোনমতে হাজিরা দিয়ে আসি। বড় ছেলে টাকা-পয়সা পাঠায় না। সে বলে, আমার ফ্ল্যাটটা তার নামে লিখে দিলে নাকি টাকা পাঠাবে। আর রাজারবাগীর মুরীদ ছেলেটাকে যদি বলি, তুমি বাসায় এসে মায়ের খেদমত করো তাহলে আমি কিছুটা ভারমুক্ত হতে পারি, একা একা আমি তো আর পারছি না! জবাবে সে বলে, সে নাকি শুধু আমাদের জন্য দু'আ করে। তার এ যাবতকালের দু'আয় আমাদের যে দশা ভবিষ্যতের দু'আয় যে কী হবে সহজেই বুঝে আসে।

কিছুদিন পর আমি মাদরাসায় ক্লাস করাচ্ছিলাম। রিংটোন বেজে উঠলে মোবাইল ধরলাম। অপর প্রান্ত থেকে ভাইজানের কান্নাজড়িত কণ্ঠ– হুযূর! সে তো আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। এখন বলুন, কি করবো! আপনি যা বলবেন, যেভাবে বলবেন, তা-ই করবো। কারণ

আমার আর কেউ নেই। হুযূর! জানাযা কিন্তু আপনিই পড়াবেন। পরপর তার কয়েকজন প্রতিবেশীও ফোনে তার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ জানালো। আমি পরামর্শ দিলাম, আপনারা প্রথমে আল-মারকাযুল ইসলামীতে নিয়ে তার গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করুন। অতঃপর সম্ভব হলে আসরের পর তার জানাযার সময় নির্ধারণ করুন। পরে জানলাম, আসরের পর নয়; বাদ মাগরিব জানাযা হবে। আসরের পর ভাইজান আমাকে বললেন, হুযূর! আমার তো শতভাগ ইচ্ছা ছিলো, জানাযাটা আপনিই পড়াবেন; কিন্তু আমার ছোট ছেলে এসে বলছে, তার মায়ের জানাযা নাকি সে-ই পড়াবে। আমি জানি, সে একটা ভণ্ড ও বেয়াদব। কিন্তু হুযূর! আমি তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। লাশ সামনে রেখে তো আর ঝগড়া করা যায় না। কাজেই আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে সে-ই জানাযা পড়াক; তার মায়ের কপালে যা আছে তাই হবে। বাদ মাগরিব জানাযার সময় দেখলাম, সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও পাগড়ী পরে আরো কয়েকজন সঙ্গীসহ সেই ছেলে জানাযা পড়াতে উপস্থিত। রাজারবাগীর মুরীদ হওয়ায় আমার আশঙ্কা হলো, সে জানাযার পরপর সম্মিলিত মুনাজাত করতে পারে। এজন্য জানাযার পূর্বেই আমি মাইকে বলে দিলাম, জানাযার নামাযই মাইয়েতের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত সম্মিলিত দু'আ। জানাযার পরপর আলাদা করে সম্মিলিত দু'আ করা ভিত্তিহীন ও বিদআত আমল। সুতরাং আমরা নামাযের পর সম্মিলিত দু'আর জন্য অপেক্ষা করবো না; বরং সকলে ব্যক্তিগতভাবেই দু'আ করবো। কিন্তু ছেলেটা জানাযার সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই লাশের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, সবাই তিনবার কুল হুওয়াল্লাহ শরীফ পড়ুন, তিনবার দুরূদ শরীফ পড়ুন। এই কাণ্ড দেখে মুসল্লীরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। বেশির ভাগ চলে গেলো। একভাগ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো যে, কী হয়! অপর ভাগ তার সাথে দু'আয় শরীক হলো। যাই হোক, এভাবে জানাযাপর্ব শেষ হলো। এদিকে বড় ছেলে মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে আসার ব্যবস্থা করেছে। ফোনে বলে দিয়েছে, সে আসার পূর্বে তার মা-কে যেন দাফন করা না হয়। কাজেই আপাতত লাশ দাফন হচ্ছে না। হিমাগারে রাখা হবে। হিমাগারে নেয়ার পূর্বে ছোট ছেলের আবদারে লাশ নেয়া হলো তার পীর রাজারবাগীর আস্তানায়। সেখানে পীর সাহেব দ্বিতীয় জানাযা পড়ালেন। অতঃপর লাশ নিয়ে হিমাগারে রাখা হলো। দু'দিনের মাথায় বড় ছেলে দেশে আসলে হিমাগার থেকে লাশ বের করে ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে করে গোরস্তানে নিয়ে আসা হলো।

গোরস্তানের পাশেই মসজিদ। আসরের নামাযের পর দাফন করা হবে। এবার বড় ছেলের খায়েশ হলো, নামাযের পর তৃতীয় জানাযা পড়িয়ে পরে দাফন করবে। একথা শুনে ছোট ছেলে বললো, মাইয়েতের একাধিক জানাযা পড়া নিষেধ; কাজেই আর জানাযা পড়া যাবে না। এ পর্যায়ে তার এক সঙ্গী বললো, আমাদের হুযূর কেবলাই তো দ্বিতীয় জানাযা পড়ালেন; দু'বার যদি পড়া যায়, তিনবার পড়া যাবে না কেন? এই বলে সে বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে লাশ বের করে মসজিদের সামনে এনে রাখলো। অতঃপর 'নামাযের পর জানাযা আছে' মর্মে ঘোষণা দিলো। বাদ আসর তৃতীয় জানাযা শেষে লাশ দাফন করা হলো। কয়েকদিন পর কুলখানীর অনুষ্ঠান করা হলো। সেখানে আমাকেও দাওয়াত করা হয়েছিলো; কিন্তু তার ছোট ছেলে এসে বিদআতী নিয়মে কুলখানী করবে জেনে আমি অপারগতা প্রকাশ করলাম। ভাইজান সহজেই আমার অপারগতা মেনে নিলেন। পরে শুনলাম, সেই কুলখানীর অনুষ্ঠানেও কেউ দাঁড়িয়ে, আর কেউ বসে বসে মীলাদ পড়েছে, যার ফলে সে অনুষ্ঠানটিও বিতর্কিত হয়েছে।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আবূ তামীম

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

এল.সি কালো পাথর

আমদানীকারক

এল.সি. কালো পাথর, সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও লোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

গ্রন্থ পরিচিতি

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. রচিত

আরকানে আরবা'আ

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

মুসলিম উম্মাহ যেভাবে ইবাদতের আকৃতি-প্রকৃতি এবং আহকাম ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তীদের নিকট পৌঁছিয়েছে তদ্রূপ ইবাদতের রূহ ও হাকীকত এবং জীবন ও সমাজের ওপর এগুলোর প্রভাবও মহামূল্যবান উত্তরাধিকার সম্পদরূপে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এভাবে ইবাদতের উভয় দিকেই অখণ্ড ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় আজ আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। এ প্রেক্ষিতে যুগে যুগে রচিত হয়েছে অগণিত গ্রন্থ। তন্মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'-সহ এ বিষয়ের সকল কিতাব মন্থন করে নব আঙ্গিকে আধুনিক রুচিসম্মতভাবে ইসলামের চারটি রুকন সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্য নিয়ে রচিত হয়েছে এক অনবদ্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ 'আরকানে আরবা'আ'।

লেখক পরিচিতি

গ্রন্থটির রচয়িতা প্রখ্যাত দাঈ ইলাল্লাহ, বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক, বিংশ শতাব্দীর এক অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব, হক ও হক্কানিয়াতের মূর্তপ্রতীক আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী মিয়াঁ নদবী রহ.।

তিনি ১৩৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ রায়বেরেলীর পূর্ব-উত্তরে ছোট্ট বস্তি দায়েরা-য় জন্মগ্রহণ করেন। কায়েদা-নায়েরা রায়বেরেলীতেই সম্পন্ন করে সেখানেই বড় ভাইয়ের কাছে উর্দু এবং আরবী ভাষা শিক্ষালাভ করেন। প্রাথমিক আরবী ভাষা শিখেন আরব-ইয়ামানী বংশোদ্ভূত শাইখ খলীল ইবনে মুহাম্মাদের নিকট। আর উচ্চতর আরবী শিক্ষা লাভ করেন আরব জাহানের স্বীকৃত আরবী ভাষাবিদ শাইখ তকীউদ্দীন হিলালীর নিকট।

ছোটবেলা থেকেই লেখালেখির প্রতি ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ। ১৩ বছর বয়সেই তার উর্দূ লেখা প্রকাশিত হয় 'যমীনদার' পত্রিকায়। ১৬ বছর বয়সেই মিসরের অভিজাততম পত্রিকায় তার দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। তাতে সম্পাদকের এমনই মুগ্ধতা ছিলো যে, তিনি সেটিকে আলাদা পুস্তিকা আকারেও প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরুল মুমিনীন হযরত সাইয়্যিদ আহমাদ বেরলবী রহ.-এর অনুপম জীবনচরিত 'সীরাতে সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ' লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নেন। তারপর বিগত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর বঙ্গানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' তাঁর এমনি এক অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, দর্শন থেকে সাহিত্য সর্বত্রই তাঁর অবাধ বিচরণ। তার 'মা-যা খসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমীন'র বঙ্গানুবাদ 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত 'আল-মুরতাযা' শীর্ষক হযরত আলী রাযি.-এর জীবনী গ্রন্থখানি আরবী, উর্দূ ও ইংরেজি ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সুলাইমান নদবীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গীলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়্যিদ আহমাদ বেরলবী রহ.-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তাঁর উর্দূ রচনার সংখ্যা ২৬৫ এবং আরবী রচনার সংখ্যা ১৭৬। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোন আলেম জন্মেছেন কি না এবং জন্মে থাকলেও তাঁর মত এতোটা সমাদৃত হয়েছেন কি না সন্দেহ আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সেসব দেশে সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কারতুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম মুসলিম পার্সনাল ল' বোর্ডের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিরাট নেয়ামত।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী রহ. ও মাওলানা আব্দুর কাদির রায়পুরী রহ. এর খলীফা ছিলেন।

১৪২১ হিজরী ২২ রমাযান (১৮/১২/২০০০খ্রি.) মুসলিম উম্মাহকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে দয়াময় আল্লাহর রহমতের ছায়া লাভ করেন।

বিষয়-বিন্যাস

লেখক রহ. গ্রন্থটিকে ৪টি অধ্যায়ে সর্বোমোট ১৪১টি শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন–

১ম অধ্যায়: সালাতের হাকীকত : কল্যাণ ও তাৎপর্য। এর অধীনে আছে ৫৬টি শিরোনাম।

২য় অধ্যায়: যাকাতের হাকীকত : কল্যাণ ও তাৎপর্য। এর অধীনে আছে ৩৯টি শিরোনাম।

৩য় অধ্যায়: সিয়ামের হাকীকত। এর অধীনে আছে ২২টি শিরোনাম।

৪র্থ অধ্যায়: হজ্জের হাকীকত। এর অধীনে আছে ২৪টি শিরোনাম

ভাষা ও ভাষান্তর

আরবী ভাষায় লিখিত এ অসামান্য ও অনুপম গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'দারুল ফাতাহ' বৈরুত থেকে ১৩৮৭ হিজরীতে। তিন-চার মাসের মধ্যেই সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রকাশকের পক্ষ থেকে লেখককে জানানো হয়, অচিরেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে আপনি পুনঃদৃষ্টি দিতে চাইলে এখনি সময়। কিন্তু প্রচণ্ড চাহিদার কারণে লেখকের পুনঃদৃষ্টি দেয়ার পূর্বেই প্রকাশক আবার ছাপতে বাধ্য হন।

এক বছরের মধ্যে গ্রন্থটির তুর্কী অনুবাদ প্রকাশিত হয় তুরস্কের 'কাওনা' থেকে। অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজিতেও অনূদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক সমাদর পায়।

ভারতে সুধীমহলে সমাদৃত কয়েকটি পত্রিকা (মা'আরিফ, বুরহান, সিদকে জাদীদ) গ্রন্থটির খুব উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করে ।

উর্দূ অনুবাদের ভার দেয়া হয় লেখকের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আল-হাসানীকে। লেখকের অন্য গ্রন্থগুলোর মত এটির অনুবাদও তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। লেখক উর্দূ পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে দেন এবং এ সময় তথ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংশোধন ও সংযোজন করেন। ফলে উর্দূ অনুবাদটি আরো পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ হয়।

বাংলা ভাষায় এটির অনুবাদ হওয়া ছিল সময়ের একান্ত দাবি। আলহামদুলিল্লাহ সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.-এর কলব ও কলমের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির নব জাগরণের অন্যতম সিপাহসালার, প্রথিতযশা আলেমে দীন হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা.বা. সেই খেদমতটি আঞ্জাম দিয়েছেন। অনুবাদটি এতটাই সাবলীল ও প্রাঞ্জল হয়েছে যে, রসে-গন্ধে ও আবেদন-নিবেদনে মূল গ্রন্থ থেকে কোন অংশে কম নয়।

বৈশিষ্ট্যাবলী

আরকানে আরবা'আ গ্রন্থে লেখক রহ. ইসলামের ৪টি রুকন তথা সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্য এবং ইসলামী শরীয়তে সেগুলোর সঠিক স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। সেই সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই বুনিয়াদী ইবাদতগুলোর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কল্যাণ ও উপকারিতা, ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের ওপর এগুলোর সুগভীর প্রভাব সম্পর্কেও পর্যাপ্ত আলোকপাত করেছেন। তিনি প্রতিটি ইবাদতের সেই ব্যাখ্যাই এখানে পেশ করেছেন যা 'খাইরুল কুরূন' তথা ইসলামের কল্যাণ শতাব্দী-ত্রয়ের দীনী প্রজ্ঞার অধিকারী ও হাকীকতসচেতন মুসলমানগণ বুঝেছিলেন এবং যে ব্যাখ্যা ইসলামী ইতিহাসের বিশিষ্টতম ও আস্থাভাজন উলামায়ে দীনের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল।

গ্রন্থটি রচনাকালে লেখক কুরআন ও সুন্নাহ নতুন করে আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছেন এবং এ ৪টি বুনিয়াদী রুকনের ওপর এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলোও পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এ ব্যাপারে লেখক সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন আইম্মায়ে ইসলামের গবেষণালব্ধ লেখনী দ্বারা যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধির দুর্লভ নেয়ামত দান করেছিলেন। দীনের সমঝ যাদের ছিল সুগভীর ও প্রান্তিকতামুক্ত। ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আহকামে ইলাহীর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বর্ণনার ক্ষেত্রে যাঁরা অনুসরণ করেছেন শরীয়ত নির্দেশিত পথ ও সাহাবায়ে কেরামের পছন্দনীয় পন্থা। এক্ষেত্রে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ. বিরচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থটি দ্বারা তিনি বেশি উপকৃত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতুলনীয় এই গ্রন্থে শাহ সাহেব চারটি বুনিয়াদী সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তার সারনির্যাস এখানে এসে গেছে। প্রয়োজনবোধে আধুনিক ও সমসাময়িক লেখকদের গ্রন্থ থেকেও নিঃসংকোচে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।

লেখক তার গ্রন্থটিতে নতুন প্রজন্মের সামনে পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহে গচ্ছিত মহামূল্যবান আমানত আধুনিক রুচিসম্মতভাবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তথ্য উপস্থাপন, ভাষাশৈলী ও বর্ণনা-পদ্ধতির দিক থেকে গ্রন্থটি যাতে যুগোপযোগী ও মানোত্তীর্ণ হয় এবং কোথাও সামান্যতম রসহীনতা অনুভূত না হয় আগাগোড়া সে চেষ্টা তিনি করেছেন। আল্লাহর সীমাহীন করুণায় গ্রন্থটি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় গুণাগুণের অধিকারী হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি এখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রচিত গোটা ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।

লেখক এ গ্রন্থে ইসলামী ইবাদত ব্যবস্থা, আহকাম ও দর্শনের সাথে অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থা, আহকাম ও দর্শনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এজন্য সকল ধর্মের তথ্য ও উপকরণাদি এমন সব সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন যা খোদ সংশ্লিষ্ট ধর্মের লেখক, চিন্তাবিদ, গবেষক ও বিদগ্ধজনদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। তুলনামূলক আলোচনাটি যাতে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও প্রান্তিকতাশূন্য হয় সেজন্য তিনি যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও দিয়ানাতদারির সাথে প্রতিটি ধর্মের সেই সারনির্যাসই উপস্থাপন করেছেন যা উক্ত ধর্মের আইন রচয়িতা ও শাস্ত্রবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য। এ তুলনামূলক আলোচনার ফলে একজন মুসলমান গভীরভাবে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম আমাদের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত ও বিনা পরিশ্রমলব্ধ কত বড় নেয়ামত এবং এজন্য তাঁর পাক দরবারে আমাদের কী পরিমাণ শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সম্ভবত এটাই আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যের তাৎপর্য। তিনি বলেছেন, 'খুবই আশঙ্কা আছে, ঐ ব্যক্তি ইসলামের এক একটি করে ইট খুলে ফেলবে, যে জাহেলিয়াতের যুগ দেখেনি বরং ইসলামী যামানাতেই পৃথিবীতে চোখ মেলেছে। (কেননা এটা সে উপলব্ধিই করতে পারবে না, শিরক ও কুফরীর কী ঘোর অন্ধকার থেকে ঈমান ও তাওহীদের কেমন স্নিগ্ধ আলোর দিকে আল্লাহ তাকে এনেছেন।)

মোটকথা, 'আরকানে আরবা'আ' শীর্ষক গ্রন্থখানি ইসলামের ৪টি প্রধান রুকন সালাত, যকাত, সিয়াম ও হজ্জ সম্পর্কে লেখা যুগ-ধর্মের প্রেক্ষাপটে যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আলোচনা সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মসমূহের উপাসনার সাথে ইসলামী ইবাদতের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এতে আলো ও আঁধারের পার্থক্য অনুধাবন করা যেমন সহজতর হয়েছে, তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের শাশ্বত নির্দেশমালার নির্যাস। গ্রন্থকার তাঁর আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, ইসলাম গুটিকয়েক প্রাণহীন অনুষ্ঠানের সংযোজন মাত্র নয়, বরং তা হচ্ছে যুগ-ধর্মের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটা বাস্তবসম্মত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন। এ দর্শনে গোঁজামিলের কোন অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীম-সহজ সরল পথ, যেখানে বক্রতার কোন স্থান নেই। পথের অনুসারীর অভীষ্ট লক্ষ্য একটাই– আর তা হচ্ছে মহান স্রষ্টার মর্জি-মাফিক জীবন পরিচালনা করে তাঁর নৈকট্য ও দীদার হাসিল করা।

আল্লাহ তা'আলা এই মূল্যবান গ্রন্থটির লেখক, অনুবাদক ও প্রকাশক-সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের নসীব করেন। আর সকলকে গ্রন্থটি বেশি বেশি পাঠ করে সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জের হাকীকত ও তাৎপর্য অনুধাবন করে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের নমুনায় এগুলো আদায় করার তাওফীক দান করেন । আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

লেখক : শাইখুল হাদীস, আশরাফুল মাদারিস,
সতীঘাটা, সদর যশোর।

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোনে মাসআলা জানতে : ০১৯১৪৬২৭৬১৩ (বাদ আসর থেকে রাত ১০টা)

মাসাইলে রমাযান

সাহরী ও ইফতারের কিছু মাসআলা

সাহরী ও ইফতারের ক্ষেত্রে কোন জায়গার সময় ধর্তব্য হবে?

সাহরী ও ইফতারের ক্ষেত্রে রোযাদার ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করে সে জায়গার সময়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। যেমন কোন ব্যক্তি সাহরী করলো সৌদিআরবে আর ইফতারের সময় ছিলো বাংলাদেশে, তাহলে সে বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী ইফতার করবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪২০, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৪/৫৫৪, কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৪২৭)

রেডিওতে আযান শুনে ইফতার করা বৈধ হবে কি না?

যদি জানা যায় যে, রেডিওতে আযান সময়মত দেয়া হয় তাহলে সেই আযানের উপর ভরসা করে ইফতার করা যাবে; অন্যথায় নয়। একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি কোন ব্যক্তি সাইরেন বাজার প্রতি লক্ষ্য করে সাহরী খায়। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১৯৫, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/৫৫৫)

বিধর্মীদের ইফতারের দাওয়াতে যাওয়া জায়েয আছে কি না?

যদি তারা খুশিমনে কোন রোযাদারকে ইফতার করাতে চায় এবং পবিত্র ও হালাল দ্রব্য দ্বারা ইফতার করায়, তাহলে তাদের ইফতারের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/১৬৬, কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৩৫১)

সাহরীর সময় জুনুবী অবস্থায় থাকলে কি করণীয়?

যদি কোন ব্যক্তি সাহরীর সময় ঘুম থেকে এমতাবস্থায় উঠল যে, সে জুনুবী অর্থাৎ তার উপর যে কোন কারণে গোসল ফরয হয়ে আছে, তাহলে পর্যাপ্ত সময় থাকলে গোসল করে নিবে। অন্যথায় হাত-মুখ ধুয়ে সাহরী খাবে। এতে রোযার কোন সমস্যা হবে না। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৪৭৬, ফাতাওয়া কাসেমিয়া ১১/৪৬৮)

যে স্থানে ছয় মাস রাত ও ছয় মাস দিন থাকে সে স্থানে রোযা রাখার বিধান হলো, প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টা হিসেব করে তাকে রাত দিনের সমষ্টি ধরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং রোযা রাখতে হবে। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২৯২, মুনতাখাব নিযামুল ফাতাওয়া ১/৪৭)

রোযা ভঙ্গের কিছু আধুনিক মাসআলা

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। কেউ যদি হাঁপানী বা অ্যাজমার কারণে ইনহেলার ব্যবহার করতে বাধ্য হয় তাহলে তার জান বাঁচানোর জন্যে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি আছে। তবে উক্ত রোযা পরে কাযা করতে হবে। আর যদি কারো এমন রোগ হয় যে, ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং পরে রোযা কাযা করাও সম্ভব না হয় তাহলে সে রোযা না রেখে প্রতিটি রোযার জন্যে একটি করে ফিদয়া দিবে। অর্থাৎ পৌনে দুই সের (১৬৫০ গ্রাম) গম/আটা বা তার সমমূল্যের টাকা গরীবদেরকে দান করে দিবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪১৮)

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন দেয়া, ইনসুলিন ব্যবহার ও স্যালাইন গ্রহণ

যেহেতু ইনজেকশন ও ইনসুলিনের ঔষধ স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পাকস্থলী বা মস্তিষ্কে পৌঁছে না তাই ইনজেকশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও এর মাধ্যমে অনেক সময় ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং শরীর ঠাণ্ডা হয়। তবে খাদ্যের কাজ দেয়– এরূপ ইনজেকশন ওযর ব্যতীত গ্রহণ করলে রোযা মাকরূহ হবে। অনুরূপভাবে স্যালাইন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্যালাইন নেয়া হয় রগের মধ্যে; পাকস্থলী বা মস্তিষ্কে নয়। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯৩, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪০৮, আহসানুর ফাতাওয়া ৮/৪২২)

এন্ডোস্কপি

চিকিৎসা পদ্ধতিতে লম্বা একটি পাইপ রোগীর মুখ দিয়ে পাকস্থলীতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। যার মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি বস্তু থাকে। আর নলটির অপর প্রান্ত থাকে মনিটরের সাথে। এভাবে চিকিৎসকগণ রোগীর পেটের অবস্থা নির্ণয় করে থাকেন। যেহেতু এন্ডোস্কপিতে নল বা বাল্বের সাথে কোনো মেডিসিন লাগানো হয় না তাই এর কারণে রোযা ভাঙ্গার কথা নয়। তবে কখনো কখনো চিকিৎসকগণ টেস্টের প্রয়োজনে নলের মধ্যে কিছু পানি ছিটিয়ে থাকে যা সরাসরি রোযা ভঙ্গের কারণ। তাই যার ক্ষেত্রে পানি বা মেডিসিন ব্যবহার করা হবে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; অন্যথায় নয়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪১৮)

এনজিওগ্রাম

হার্টের রক্তনালী ব্লক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে কেটে একটি বিশেষ ধমনীর ভেতর দিয়ে (যা হার্ট পর্যন্ত পৌঁছে) ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে এনজিও গ্রাম বলে। উক্ত ক্যাথেটারটি পেটের অভ্যন্তরে রোযা ভঙ্গের কোন গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় ঢুকে না এবং গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়েও ঢুকে না, তাই এতে রোযা নষ্ট হবে না, যদিও ক্যাথেটারে কোনো মেডিসিন লাগানো থাকে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪১৮)

রক্ত দেয়া ও নেয়া

রক্ত দিলে অথবা নিলে কোন অবস্থাই রোযা নষ্ট হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৬)

যদি কোন স্ত্রীলোক রমাযান মাসে ঔষধের মাধ্যমে হায়েযের রক্ত বন্ধ করে রোযা রাখে তাহলে রোযা হয়ে যাবে। তবে রোযা রাখার জন্য ঔষধের মাধ্যমে হায়েযের রক্ত বন্ধ করা উচিত নয়। বরং চিকিৎসকদের মতে তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ জন্য হায়েয বন্ধ না করে পরবর্তীতে রোযা কাযা করে নিবে। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/৪০৪)

রোযা রাখার দরুণ যদি মায়ের স্তনে পর্যাপ্ত দুধ না আসে আর এতে বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে মায়ের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। তবে রোযা অবস্থায় বাচ্চাকে দুধ পান করালে রোযা নষ্ট হয় না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪২২)

যে কোন ধরনের ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে গলার ভিতরে প্রবেশ করালে রোযা

ভেঙ্গে যাবে। এতে কাযা কাফ্ফারা উভয়টি জরুরী হবে। যেমন, বিড়ি, সিগারেট, আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৫)

শ্রমিক, রিকশা চালক, ড্রাইভার, দিনমজুর ব্যক্তিবর্গ রমাযান মাসে কষ্টকর কাজে লিপ্ত থাকেন বলে তারা সাধারণত মনে করেন যে, তাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে, বিষয়টি এমন নয়; বরং তারা যদি রোযা না রাখে তাহলে কাযা আদায় করতে হবে। আর রেখে ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গে ফেললে কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে। (আল-বাহরুর রায়িক ২/২৮২, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৯৫, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৬১)

রোযা অবস্থায় কেউ গুলিবিদ্ধ হলে যদি গুলিটি পেটের ভেতরে ঢুকে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে যায় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। আর বের না হয়ে ভেতরে থেকে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ২/৯৮, ফাতহুল কাদীর ২/২৬৬, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৪/১৬৭)

রোযা অবস্থায় সহবাস ব্যতীত স্বামী-স্ত্রী-সুলভ আচরণ করার কারণে কিংবা হস্তমৈথুন করার দ্বারা যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এই রোযার কাযা আদায় করতে হবে। তবে স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪০৪)

রোযা রেখে মহিলাদের ঠোঁটে লিপিস্টিক বা লিপজেল ব্যবহার করা জায়েয। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন মুখে চলে না যায়। কারণ মুখে চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয়ে যাবে। আর গলায় স্বাদ অনুভব হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (কিতাবুল ফাতাওয়া ৩/৩৯৮)

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়

রোযা অবস্থায় রোযাদার ব্যক্তির জন্য এমন কোন জিনিসের স্বাদ আস্বাদন করা মাকরূহ, যা গলধঃকরণ হয়ে পেটে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন রোযাবস্থায় টুথপেস্ট, মাজন, গুল ইত্যাদি ব্যবহার করা। (ফাতাওয়া শামী ২/৪১৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬১)

সাহরী বিলম্ব করে করা মুস্তাহাব। তবে এত বিলম্ব না করা উচিত, যার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, সাহরীর সময় বাকী আছে কি না? কেননা এরূপ সন্দেহযুক্ত সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬২)

রোযা অবস্থায় রোযাদার ব্যক্তির জন্য নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে এবং কুলি করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা মাকরূহ (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো এবং কুলি করার ক্ষেত্রে গড়গড়া করা)। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬২)

কোন মহিলার জন্য তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখা মাকরূহ। তবে স্বামী যদি অসুস্থ থাকে অথবা স্বামী স্বয়ং রোযাদার হয় অথবা হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬৩)

রোযা অবস্থায় যে কোন ধরনের গুনাহ করার দ্বারা রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। চাই গুনাহ যবান দ্বারা হোক (যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা) অথবা চোখ দ্বারা হোক (যেমন, টেলিভিশন বা শরীয়ত বিরোধী কোন ভিডিও দেখা) অথবা কান দ্বারা হোক (যেমন, গান বাদ্য ইত্যাদি শ্রবণ করা) অথবা হাত-পা দ্বারা কোন গুনাহের কাজ করা। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭০৭)

রোযা অবস্থায় মুখে থুথু জমা হয়ে গেলে, তা গিলে ফেলার দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত থুথু জমা করে তারপর গিলে ফেলা মাকরূহ। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬০)

রোযা অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর এমন আচরণ করা মাকরূহ, যার মাধ্যমে সহবাস বা বীর্যপাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন, খোশ আলাপ করা, চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা ইত্যাদি। তবে যদি সহবাসে লিপ্ত না হওয়া বা বীর্যপাত না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত থাকে, তাহলে উক্ত কাজগুলো দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪১৭, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৬২)

কাযা ও কাফ্ফারার বিধি-বিধান

কাযা-কাফ্ফারার পরিচিতি

রোযার কথা স্মরণ থাকাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি রমাযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার কিংবা সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তার উপর কাযা (ছুটে যাওয়া একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা রাখা) এবং কাফ্ফারা উভয়টি আবশ্যক।

কাফ্ফারা হলো, বিরতিহীনভাবে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা। শারীরিক অক্ষমতার দরুন লাগাতার রোযা রাখা সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকীনকে তথা যার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয় এমন ব্যক্তিকে দুই বেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো কিংবা একজন মিসকীনকে ষাট দিন খানা খাওয়ানো বা ষাটটি সদকায়ে ফিতর দিয়ে দিলেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে, তবে এক্ষেত্রে বিরতিহীনভাবে লাগাতার খানা খাওয়ানো জরুরী নয়। (আল-হিদায়া ১/২১৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২০৫, ২০৬, ৫১৪, হাশিয়াতুত তাহতাবী; পৃষ্ঠা ৬৭০)

কাফ্ফারার টাকা মাদরাসা-মসজিদে দান করার বিধান

কাফ্ফারার টাকা গরীব-মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয়া আবশ্যক। কাজেই মাদরাসা ও মসজিদের আসবাবপত্র ক্রয় কিংবা নির্মাণ ফান্ডে কাফ্ফারার টাকা ব্যয় করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না, তবে যদি মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে দান করা হয়, তাহলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৭৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/৪৪৯)

স্ত্রী কাযা রোযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করতে অপারগ হলে করণীয়

কাফ্ফারার রোযাগুলো ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যক। কোন কারণে (যেমন, অসুস্থতা, ভুলে যাওয়া, দ্বিতীয় রমাযান মাস এসে যাওয়া ইত্যাদি) ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে পুনরায় লাগাতার ষাটটি রোযা রাখা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে আদায়কৃত রোযাগুলো নফল বলে গণ্য হবে। তবে স্ত্রী-লোকের ক্ষেত্রে স্বামী যদি রমাযানের কাফ্ফারার লাগাতার কাযা রোযা আদায় করতে না দেয়, তাহলে লাগাতার রোযা না রেখে যখন সুযোগ হয়, তখন হিসেব করে রোযাগুলো আদায় করবে।

তবে একথা মনে রাখতে হবে, স্বামীর অসন্তুষ্টিকে ওযর হিসেবে গণ্য করে কাযার বদলে ফিদিয়া দেয়া কিছুতেই জায়েয হবে না। (মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ১৭৩, হাশিয়াতুত তাহতাবী ১/৪৪৬)

নাবালেগকে কাফ্ফারা দেয়ার হুকুম

নাবালেগ বাচ্চার পিতা যদি ধনী হয়, যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত না হয়, তাহলে এমন নাবালেগ বাচ্চাকে খাওয়ানোর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না; বরং উক্ত কাফ্ফারা পুনরায় আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৫/১৪৪, বেহেশতী যেওর ৩/৩৬০)

তারাবীহ নামাযের মাসাইল

বিশ রাকআত তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এ বিষয়টির উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। অতএব এ নামায পড়া বাঞ্ছনীয়। ত্যাগকারী তিরস্কারের উপযুক্ত। (সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী; হা.নং ৪৬১৫, আউজাযুল মাসালিক ১/৩৮৩)

তারাবীহ নামায জামাআতের সাথে আদায় করা শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়াহ। আর মহিলাদের জন্য একাকী পড়ে নেয়াই শ্রেয়। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫২৪-৫২৫)

তারাবীহ নামাযের সময় ইশার নামাযের পর। অতএব ইশার নামাযের পূর্বে তারাবীহ পড়া হলে তা আদায় হবে না। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/২৭৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১১৭)

রমাযানের চাঁদ দেখার সংবাদ বিলম্বে পাওয়ার দরুন ইশা ও বিতর উভয় নামায আদায় করা হয়ে গেলেও ঐ রাতের তারাবীহ নামায আদায় করতে হবে। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৬৭, মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ২২৫)

তারাবীহ নামায দুই বা ততোধিক কারী সাহেবের ইকতিদায় আদায় করা হলে উত্তম হলো, প্রত্যেক কারী সাহেব কোন এক তারবীহার তথা চার রাকাআতের পর নিজ নামায শেষ করবে। যদি কোন কারী সাহেব তারবীহার মাঝখানে (উদাহরণত দশ রাকাআতের মাথায়) নিজ নামায শেষ করেন এবং পরবর্তী কারী সাহেব তারবীহার মাঝখান থেকে (উদাহরণত একাদশ রাকাআত থেকে) নামায পড়ানো আরম্ভ করেন তাহলে তা সুন্নাতের পরিপন্থী হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/১১৬, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১/২২)

বি.দ্র. তারাবীহ নামাযের প্রতি চার রাকাআতকে তারবীহা বলে। তারবীহা অর্থ বিশ্রাম নেয়া। এর বহুবচন হল তারাবীহ। যেহেতু এ নামাযে প্রতি চার রাকাআত অন্তর বিশ্রামের জন্য বিরতি দেয়া হয় তাই এই নামাযকে তারাবীহ বলা হয়।

তারাবীহ নামাযের প্রত্যেক চার রাকআতের পর কিছুক্ষণ বসে তাসবীহ, তাহলীল ও দরূদ ইত্যাদি পড়া ও যে কোন যিকির করা যায়। একেবারে চুপ থাকাও জায়েয আছে, তবে নির্দিষ্ট কোন দু'আ বা যিকিরকে আবশ্যক মনে করা ঠিক নয়। (আল-বাহরুর রায়িক ২/১২২, ফাতাওয়া শামী ২/৪৬)

দেখা যায়, কিছু সংখ্যক মুক্তাদী তারাবীহ নামায আরম্ভ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নামাযে শরীক না হয়ে পেছনে বসে থাকে। যখন ইমাম সাহেব রুকুতে যান তখন তাড়াহুড়া করে নামাযে শরীক হয়। বিনা ওযরে এমনটা করা মাকরূহ। এটা নামাযের প্রতি অলসতা ও অবহেলার বহিঃপ্রকাশ এবং মুনাফিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। (আল-বাহরুর রায়িক ২/৭৫, ফাতাওয়া শামী ২/৪৮)

যে হাফেযে কুরআনের বয়স চান্দ্র বৎসর হিসেবে এখনও পনের বছর হয়নি এবং তার মধ্যে বালেগ হওয়ার কোন আলামতও (চিহ্ন) পাওয়া যায়নি, এমন নাবালেগের তারাবীহ নামাযসহ কোন নামাযে বালেগ মুসল্লীদের ইমামতি করা জায়েয নেই। তবে তার জন্য বালেগ ইমামের লোকমা দেয়া জায়েয আছে। (আল-হিদায়া ১/১২৪, ফাতাওয়া শামী ১/৫৭৯)

ইতিকাফ বিষয়ক মাসাইল

ইতিকাফ হল ইবাদত ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে পুরুষদের জন্য মসজিদে ও মহিলাদে জন্য নিজ ঘরে নামাযের স্থানে অবস্থান করা।

ইতিকাফ তিন প্রকার :

(১) ওয়াজিব

(২) সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া; রমাযানের শেষ দশকে।

(৩) মুস্তাহাব।

ইতিকাফকারী উযূ-ইস্তিঞ্জার জন্য, জামে মসজিদে জুমু'আ আদায় করার জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারবে। (ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৪১৩)

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় প্রয়োজনীয় বেচা-কেনার কথাবার্তা বলা জায়েয আছে। তবে পণ্য মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করানো যাবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৩১)

ইতিকাফকারী আযান দেয়ার জন্য মসজিদের বাইরে গেলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৬)

ইতিকাফকারীর জন্য ইতিকাফ আবস্থায় মসজিদে বিবাহ করা জায়েয আছে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৬)

ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদে অবস্থানকালীন জরুরী চিঠি-পত্র লেখা এবং ধর্মীয় বই-পত্র লেখা জায়েয। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৫০)

ইতিকাফকারী মসজিদের মেহরাবে যেতে পারবে। কেননা তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। (কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪২০)

মসজিদের বারান্দা যদি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ইতিকাফকারী বারান্দায় যেতে পারবে।

ইতিকাফকারী যদি শরীয়তসম্মত কোন কারণে মসজিদের বাইরে বের হয় (যেমন উযূ-ইস্তিঞ্জার জন্য), আর এদিকে জানাযা উপস্থিত হয়ে যায়, তাহলে জানাযায় শরীক হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪৬)

ইতিকাফকারী শরীয়তস্বীকৃত কোন প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে, রাস্তায় চলার পথে কারো সাথে কুশল বিনিময় করা জায়েয আছে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৫)

যে সকল কারণে ইতিকাফ ভেঙ্গে যায়

ফরয ও সুন্নাত গোসল ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে গিয়ে গোসল করলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। হ্যাঁ, যদি খুব বেশি গরম পড়ে, তাহলে যখন ইস্তিঞ্জার জন্য বের হবে, তখন দ্রুত সময়ে তিন চার মগ পানি মাথায় ঢেলে চলে আসবে। এতে ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না। (কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪১৮)

জানাযার নামাযের জন্য বা অগ্নিদগ্ধ, ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৬)

আমাদের সমাজে কোন কোন জায়গায় এমন প্রথা রয়েছে যে, সেখানে বিনিময় দিয়ে ইতিকাফে বসানো হয়, এতে ইতিকাফ সহীহ হবে না। উল্লেখ্য, ইতিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, সুতরাং স্বেচ্ছায় এতে সবাই আগ্রহী হওয়া উচিত। (ফাতাওয়া শামী ৯/৭৬)

মসজিদ সংলগ্ন মাঠ বা চত্বরে গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। যদিও মাঠ বা চত্বর মসজিদেরই ওয়াকফকৃত জায়গায় হয়। (হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পষ্ঠা ৬৯৯)

যে সকল কারণে ইতিকফ মাকরূহ হয়ে যায়

ইতিকফকারী সওয়াবের নিয়তে চুপ থাকলে ইতিকাফ মাকরূহ হয়ে যায়। উত্তম হলো, যিকির, কুরআন তিলাওয়াত, দীনী মুযাকারায় আত্মমগ্ন হওয়া। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৫০)

ইতিকাফ অবস্থায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করলে ইতিকাফ মাকরূহ হয়ে যায়। যদিও পণ্য মসজিদের বাইরে থাকে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪৮)

ইতিকাফ ভেঙ্গে গেলে করণীয়

রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফকালে কোন কারণে ইতিকাফ ভেঙে গেলে যেদিন ইতিকাফ ভেঙ্গেছে শুধু ঐ দিনের ইতিকাফ রমাযানের পরে রোযাসহ কাযা করতে হবে। ঈদের পূর্বের অবশিষ্ট দিনগুলো কাযা করতে হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৪৪)

যদি কোন কারণে ইতিকাফ ভেঙ্গে যায় তাহলে তার জন্য বাড়িতে ফিরে আসার ইখতিয়ার রয়েছে। অবশিষ্ট দিনগুলোর জন্য দ্বিতীয়বার ইতিকাফ করা জরুরী নয়। তবে অবশিষ্ট দিনগুলোতে নফলের নিয়তে ইতিকাফ করে নেয়া উচিত। (কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪২০)

মহিলাদের ইতিকাফের কিছু মাসাইল

মহিলাগণ তাদের ঘরে কোন স্থান নির্ধারণ করে ইতিকাফে বসবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৫)

মহিলাগণ ইতিকাফ অবস্থায় তাদের নির্ধারিত কামরা থেকে বের হয়ে অন্যত্র গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২৭৫)

মাসিক অবস্থায় ইতিকাফ করা সহীহ নয়। কারণ উক্ত আবস্থায় রোযা রাখা জায়েয নেই। আর মাসনূন ইতিকাফের জন্য রোযা জরুরী। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২১১)

যে মহিলার রমাযানের শেষ দশকে হায়েয (মাসিক) আসার প্রবল ধারণা হবে, তার জন্য ইতিকাফে বসা উচিত নয়। এরপরও যদি বসে তাহলে হায়েয আসার পর ইতিকাফ ভেঙ্গে দিবে এবং পরবর্তীতে শুধু একদিন রোযাসহ ইতিকাফ কাযা করবে। (কিতাবুন নাওয়াযিল ৬/৪২০)

যাকাতের মাসাইল

বীমা, ইন্সুরেন্স এবং ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত টাকার যাকাত

জীবন বীমা, অন্যান্য ইন্সুরেন্স এবং ব্যাংকে সঞ্চয়কৃত টাকা নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব। বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সে টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। তবে উক্ত টাকা থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং তা গরীব-অসহায়দের মাঝে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দিতে হবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত

সরকারী চাকুরীজীবিদের বেতন থেকে প্রতি মাসে নির্ধারিত পরিমাণে প্রভিডেন্ট ফান্ডের নামে যে টাকা কেটে নেয়া হয় তা হাতে আসার পর পূর্ণ একটি বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। উক্ত টাকা হাতে আসার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

বন্ড এর যাকাত

সরকার ও বিভিন্ন কোম্পানী অনেক সময় সাধারণ লোকদের থেকে ৫ বা ১০ বছর মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে এবং উক্ত ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ সুদ প্রদান করে। ঋণ গ্রহণের সময় ঋণদাতাকে একটি ঋণ প্রদানের নিশ্চয়তাপত্র প্রদান করা হয় যা বন্ড নামে পরিচিত। উক্ত ঋণের উপর যাকাত ওয়াজিব। ঋণ হস্তগত হওয়ার পর ঋণদাতার উপর বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। তবে উক্ত টাকা থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে। (সুনানে কুবরা বাইহাকী; হা.নং ৭৬২৪, বাদায়িউস সানায়ে' ২/১০, ফাতাওয়া শামী ২/৩০৫)

প্লটের উপর যাকাত

প্লট ক্রয়ের সময় যদি ব্যবসার নিয়ত থাকে তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বাজারমূল্য হিসেবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি ক্রয়ের সময় ব্যবসার নিয়ত না থাকে বরং তাতে বাড়ী করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ পরবর্তীতে ব্যবসার নিয়ত করলে বিক্রি করার পূর্বে সে প্লটের যাকাত আদায় করতে হবে না। বিক্রি করার পর বিক্রিত মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৬৭, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৬৬)

হজ্জের জন্য জমাকৃত টাকার যাকাত

অনেকে হজ্জের জন্য টাকা জমা করতে থাকে। সে টাকা নেসাব পরিমাণ হয়ে গেলে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্তে যাকাত আদায় করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/২৬২, হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃষ্ঠা ৭১৫)

সিকিউরিটি মানির যাকাত

বর্তমানে আমাদের দেশে দোকান, বাড়ী, ফ্ল্যাট ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিতে (Advance) অগ্রিম টাকা আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

এক. অফেরতযোগ্য, যা চুক্তি অনুযায়ী মাসে মাসে নির্ধারিত পরিমাণ ভাড়া উক্ত অগ্রিম টাকা থেকে দোকানের মালিক কেটে নিয়ে থাকে। এর বিধান হচ্ছে, দোকানের মালিক উক্ত টাকা গ্রহণ করার পর সে পূর্ণ মালিক হয়ে যায়। তাই মালিক নিজ প্রয়োজনে উক্ত টাকা খরচ করতে পারবে এবং বছরান্তে এ টাকা অবশিষ্ট থাকলে অন্যান্য সম্পদের ন্যায় মালিকের উপর এ টাকারও যাকাত আসবে।

দুই. ফেরতযোগ্য, যা ভাড়া হিসেবে কেটে নেয়া হয় না। বরং দোকানের মালিকের নিকট যামানত হিসেবে থাকে এবং চুক্তি শেষে উক্ত টাকা ভাড়াটিয়াকে ফেরত দিতে হয়। অ্যাডভান্সদাতা/ভাড়াটিয়াই এ টাকার পূর্ণ মালিক থাকে। তাই এ টাকার যাকাত তার যিম্মায় আসবে এবং এ টাকা হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। (আল-মাবসূত লিস-সারাখসী ২/১৯৬, আল-ইনায়া শরহুল হিদায়া ২/১৬৭, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৯)

বিকাশের মাধ্যমে যাকাত আদায়

যদি যাকাত গ্রহীতার নিকট বিকাশের মাধ্যমে যাকাতের টাকা পাঠানো হয় তাহলে নগদ ক্যাশ যাকাত গ্রহীতার হাতে পৌছার আগ পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না। এক্ষেত্রে বিকাশ খরচ যাকাত আদায়কারীকে বহন করতে হবে। যাকাতের টাকা থেকে বিকাশ খরচ দেয়া যাবে না। (কিতাবুন নাওয়াযিল; পৃষ্ঠা ৬০৪)

কল্যাণসংস্থা ও ফাউন্ডেশনে যাকাত প্রদান

বিভিন্ন কল্যাণ সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, যদি কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তারা যাকাতের অর্থ যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয় তাহলে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা বৈধ হবে। তবে যাকাত আদায়কারীর যাকাত আদায় ধর্তব্য তখনই হবে যখন উক্ত প্রতিষ্ঠান যাকাতের টাকা কোন উপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রদান করবে। আর যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যায় কিংবা সে প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তির হাতে না পৌছায় তাহলে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা বৈধ হবে না। (জাদীদ মাসাইল কা হল; পৃষ্ঠা ১৩৮)

রিয়াল ও ডলারের যাকাত

কোন ব্যক্তির নিকট যদি নেসাব পরিমাণ রিয়াল বা ডলার থাকে অথবা অন্য কোন অর্থের সাথে মিলিয়ে নেসাব পরিমাণ হয় তাহলে উক্ত রিয়াল বা ডলারের উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।

এক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের দিন দেশীয় মুদ্রায় রিয়াল বা ডলারের বিক্রয়মূল্য ধর্তব্য হবে। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/১১১)

জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয়

জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন, সড়ক ও সেতু নির্মাণ, নলকূপ বসানো, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ, কাফন-দাফন ইত্যাদি কাজে যাকাত প্রদান করা জায়েয নেই। কেননা যাকাতের টাকা গরীব মিসকীনকে নিঃশর্তে বিনিময়হীনভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া আবশ্যক। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৪)

সদকায়ে ফিতর

কার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব এবং কার উপর ওয়াজিব নয়

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যে ব্যক্তি ঋণমুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা সমমূল্যের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন সম্পদের মালিক হবে, উক্ত সম্পদ চাই ব্যবসায়ী সম্পদ হোক বা অন্য কোন সম্পদ হোক তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। সুতরাং যে সন্তান ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করবে তার পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/১৯৬)

সদকায়ে ফিতর আদায় করার সময়

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুন্নাত হলো, ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে যাওয়া। যদি এ সময় আদায় না করে থাকে তাহলে পরবর্তীতে আদায় করে দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার যিম্মায় ওয়াজিব বাকি থাকবে। কেউ ঈদের দিনের আগেই রমাযান মাসে আদায় করে দিলে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী সেটাও সহীহ আছে। আর রমাযানের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করলে কেউ কেউ বলেছেন, আদায় হয়ে যাবে। তবে সতর্কতা হলো, রমাযানের পূর্বে আদায় না করা। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৬৫, বাদায়িউস সানায়ে' ২/৫৪৪)

সদকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম পদ্ধতি

একজন গরীবকে পূর্ণ একটি ফিতরা দেয়া উত্তম। তবে একটি ফিতরা কয়েকজন গরীবকে ভাগ করে দেয়াও জায়েয আছে। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৬৭)

পিতা-মাতা, স্বামী/স্ত্রী ও বালেগ সন্তানাদি যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয় তাহলে তাদের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে না। তবে তারা যদি নিজেরা প্রয়োজনাতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে তাদের নিজেদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২১১)

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'র

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

মা'হাদ উচ্চতর গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে তার কার্যক্রমের সূচনা করলেও ইতিমধ্যেই মকতব, নাযেরা ও তাহফীযুল কুরআন বিভাগসমূহের মাধ্যমে তা সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কিতাব বিভাগের প্রথম জামাআত তাইসীর খোলা হবে ইনশা-আল্লাহ।

ভর্তির নীতিমালা

দুই বছর মেয়াদী ফিকহ ও ফতওয়া বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

ক. হিদায়া আখেরাইন, খ. নূরুল আনওয়ার, গ. বিষয়ভিত্তিক আরবী-বাংলা প্রবন্ধ, ঘ. মৌখিক পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে।

ভর্তির যোগ্যতা

দুই বছর মেয়াদী ফিকহ ও ফতওয়া বিভাগ	ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে তাকমীল জামাআতে ন্যূনপক্ষে জায়্যিদ জিদ্দান (প্রথম বিভাগ)-এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
জামাআতে তাইসীর	ক. বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে সক্ষম হতে হবে। খ. অনুবাদসহ উর্দূ কায়েদা পাঠে সক্ষম হতে হবে।
তাহফীযুল কুরআন বিভাগ	ক. তাজবীদ-সিফাত অনুকরণে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে সক্ষম হতে হবে। খ. ভর্তিচ্ছু তালিবে ইলমের বয়স অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে।
নাযেরা (দেখে কুরআন পাঠ) বিভাগ	ক. তাজবীদ-সিফাত অনুকরণে বিশুদ্ধ আমপারা পাঠে সক্ষম হতে হবে। খ. ভর্তিচ্ছু তালিবে ইলমের বয়স অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে।
মকতব (প্রাথমিক শিশু শ্রেণী) বিভাগ	পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রের বয়স ৫ বছর হতে অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে।

ইংরেজি শিক্ষিত ও বয়স্কদের জন্য 'ফরযে আইন কোর্স'

মা'হাদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় হিজরী বর্ষের শাওয়াল মাস থেকে। সুতরাং হিজরী বর্ষের শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ থেকে মা'হাদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।

যোগাযোগ

বাড়ি- ১৩, রোড- ২, ব্লক- ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।

মোবাইল : ০১৯৪০৩৭৬৭৪০, ০১৮৪০৯৩১৮০০

কিশোর প্রতিভা

আমার প্রথম বিদ্যাপীঠ

আমার প্রথম বিদ্যাপীঠ নানুবাড়ির ছোট্ট মাদরাসাটি। আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে আম্মুর অসুস্থতায় ছয় মাস সেখানে থাকতে হয়েছিল। বয়স তখন সাড়ে চার, বই-খাতার যত্ন অনেকটা শিখে গেছি। তাই আব্বুও মাদরাসায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন। গ্রামের ছোটখাট একটা ইলমী কানন। প্রায় শ'য়ের কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রী। চারকোণা জায়গার দুই সাইডে বড় দু'টো হলরুম, পাশে সাজানো গোছানো ছোট্ট একটা অফিস রুম আর বাকিটুকু সবুজে ঢাকা সতেজ মাঠ। কিনারগুলোতে হরেক রঙের সুন্দর ফুলের টব ছিল। পলিথিনে মাটি ভরেও অনেক ছাত্ররা ফুল নিয়ে আসত। এগুলোর পরিচর্যা বড় ছাত্ররাই করত; যেহেতু তারা আবাসিক থাকত। কয়েকজন উস্তাদ ছিলেন। একজনকে আমরা পুরান হুযূর বলে ডাকতাম। তিনি তার স্ত্রী ও তিন মেয়েসহ মাদরাসার এক কোণার একটা ঘরে থাকতেন। তিনি যেমন দরদী ছিলেন, তেমনি বেশ কঠোরও ছিলেন। সবক না দিতে পারলে আর অনিয়ম পাওয়া গেলে আর রেহাই নেই। যাকে মারত সে তো নাচতই, বাকীদের অবস্থাও হতো দেখার মতন। এতে অনেক ফায়দা হতো। আমরা অনিয়ম করার কল্পনাই করতে পারতাম না। সেই শিশুসুলভ মস্তিষ্কে এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়েছিল যে, নিয়মের বাইরে যে কোন কাজ করলেই পাকড়াও হতে হবে। তবে এখন অনেক মাদরাসায় শোনা যায় মারা নিষেধ। মেয়ে বা ছেলে বড় হয়ে গেছে; তাকে আবার মারা যায়! সে কি এখনো শাস্তির বয়সে রয়ে গেছে! কিন্তু বাবা-মা'র কাছে তো কোন সময়ই বড় হয় না; তবে আসাতিযায়ে কেরামের ক্ষেত্রে বিপরীত কেন? অথচ ছেলে বা মেয়েকে গড়ার পেছনে একজন উস্তাদই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাবার থেকে এগিয়ে থাকেন।

নানুবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মাদরাসার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো ভাবছিলাম। প্রত্যেকবারই এখানে এলে মাদরাসার ভেতর-বাহির পুরোটা দেখে যাই। সেই স্মৃতিগুলো জীবন্ত হয়ে চোখের কোণে টলমল করে। আর তেমন কিছু আগের মত নেই। পুরান হুযূর সেই কবে সপরিবারে চলে গেছেন। আগের উস্তাদও কেউ নেই। মাদরাসার মাঠটি এখন বিরান, কতগুলো আগাছা জন্মে আছে। মাদরাসার পাশের বড় দিঘিটাও নিঃসঙ্গ দিন কাটাচ্ছে। মাদরাসার ভেতরটা দেখতে গেলে নিজের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আগের মতই মাটির উপর কাগজের কার্পেট বিছানো।

একদিনের কথা আমার খুব মনে পড়ে। পরীক্ষার পর হুযূর কথা বলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বসলেন। নিয়মানুযায়ী বড় ভাইয়ারা ছিলেন সামনে। ছেলেদের একটা অভ্যাস আছে, বসার সময় পাঞ্জাবীর পিছন দিকটা ছড়িয়ে বসে। আমি এক ভাইয়ের পিছনে বসতে গেলাম। ওমা! দেখি সাহেবের মত পাঞ্জাবীখানা ছড়িয়ে বসে আছে। এদিকে মানুষের বসার জায়গা হচ্ছে না, আর তিনি বসেছেন পাঞ্জাবীসহ! ভাবলাম, আল্লাহ আমার জন্য এত সুন্দর জায়গা রেডি রেখেছেন; হেলা করি কী করে! ভদ্রভাবে পাঞ্জাবীর উপরই বসে গেলাম। তিনি হুযূরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আর আমি কিনা তার পাঞ্জাবীতে বসে সমানে নড়ছি; তার খবরও নেই। হুযূরের কথা শেষ হওয়ার পর তিনি উঠতে গিয়েও পারছেন না। আমি যে পাঞ্জাবীর উপর বসা। ব্যাপার কী দেখার জন্য পেছন ফিরতেই দু'জনে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আস্তে করে পাঞ্জাবী ছেড়ে দাঁড়ালাম। ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবীর বে-হালত দেখে বেচারা কেঁদেই ফেলবে যেন। আমার দিকে তাকাতেই 'বে-আক্কইল্যা' এক হাসি দিয়ে দিলাম দৌড়।

আজ মাদরাসার দিকে তাকালে হাসিটা হারিয়ে যায়। কী জমজমাট এক ইলমী কানন মৃতপুরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। মাদরাসার প্রতিটা বালুকণাই হয়ত চায় মৌমাছিগুলো আবার ফিরে আসুক। ফুলে ফুলে ভরে যাক উদ্যান।

রাবেয়া হুসাইন
মহাখালী, ঢাকা।

তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে

ভোর সকালে 'ফেবু শরীফ' মুতালাআর মধ্য দিয়েই শুরু হয় আমাদের সকাল। কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, অযীফা আদায়- এসব এখন পুরোনো সেকেলে। মানে ফেসবুক পাঠের মাধ্যমে আমাদের দিন শুরু হয়। তথ্য-প্রযুক্তির যুগ বলে কথা!

শুনেছি, একসময় গ্রামে পলো বাওয়া উৎসব হতো। ধান কাটার পর পিঠাপুলির উৎসব হতো। আনন্দ উৎসবে পাড়া-গাঁও মুখরিত হয়ে উঠতো। ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে সে আনন্দে উৎসবের আমেজ তৈরি হতো। আর এখন...! এখন ওসবের দিন নেই। এখন চলে পশ্চিমা সংস্কৃতির রমরমা সস্তা বাণিজ্য এবং তাদের যন্ত্র-বাদ্য। এখন যে যত ইংলিশ-হিন্দি গানে মাতোয়ারা হতে পারে, সে তত আধুনিক, তত উদার ও সংস্কৃতিমনা।

এ তো গেল বাঙালির চিরচেনা অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতির ধ্বস-কথন। কাজের কথায় আসি। যে যত দামি ফোন ব্যবহার করবে সে তত আধুনিক এবং আপডেট। কারণ সে নাকি যুগের ভাষা বোঝে; বোঝে যুগচাহিদা।

আর যদি কারো মুখে শোনে কখনও অনলাইনের হরেক সুযোগ সুবিধা প্যাকেজের বাড়তি তেলেসমাতির কথা, তবে তো কথাই নেই! আজকাল আমিই অবশ্য যে হারে রোজ রোজ অফার ম্যাসেজ পাচ্ছি। তাতে সাড়া দিলে খুব শীঘ্রই পথে বসার কায়দা হতো। এত এত অফার শুনে কারো তো অবস্থা এমনই যে, জায়গা-জমি বেচে, ধার কিস্তি কর্জ করে হলেও একটা ফোন তাকে কিনে দিতেই হবে; নইলে যে সমাজে চলা দায়! আর ব্যাকডেটেড তকমা তো আছেই। এছাড়াও এখন কত কী যে রটে ঘটে? তা কি সব বলে লিখে বোঝানো যায়! কেউ তো সোজা বলেই বসে যে, হেন করেগা তেন করেগা! এ যুগে ফোন ছাড়া কি চলে?

তাইতো শুনি, রাত দুপুরেও নাকি কেউ কেউ ঘুমে জাগরণে এটাকে ওটাকে মেরে ওঠে। মানে হরহামেশাই তিনি গেমস্ খেলায় বিভোর। আরও অবাক হই, যখন কোনো পুচকে ছোকরা আমায় ওসবের তালিম দেয়। এ যে কেমন নেশা! খাবার-দাবার, আরাম-আয়েশ- ওসবে কুচ পরওয়া নেহি! আগে দেখেছি বইপোকা; এখন দেখছি ফোনপোকা। এখানেই শেষ? না, না! এখন সে রীতিমতো আত্মভোলা। কোথায় মা-বাবা আর কোথায় তার সামাজিক অবস্থান; কোনো খবর তার নেই! নেই ভালো-মন্দ হুঁশ-জ্ঞান! কি পথ, কি বাজার-হাট, কি লোকালয়, কি বিরান ভূমি, সর্বদা সে এখন ব্যস্ত। ওই যে বললাম, কুচ পরওয়া নেহি! এখন সে কাউকে গণে না। কাউকে দেখার, বোঝার বা জানার সময় তার নেই। সে এখন মহাব্যস্ত। ডিজিটাল যুগ তো! তাই।

পাঠক! ক্ষমা করুন, অনেক লম্বা সময় নিয়ে আপনি এখনো এই লেখা পড়ছেন। ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না। যেহেতু তথ্য-প্রযুক্তির যুগ এটা;

বিজ্ঞানের জয়জয়কার সর্বত্র। তাই কুরআন তিলাওয়াতের বদলে ফেসবুক দিয়েই আমাদের ভোর হচ্ছে। আযানের ধ্বনি শুনেই হয়তো বা কেউ ঘুমের দেশে ফিরছে! মানে রাত জেগে অনলাইনে কাটিয়েছে। যেই না মুয়ায্যিন আযান ফুঁকেছে– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ...আস্সালাতু খইরুম মিনান নাউম– ঘুম হতে নামায উত্তম! তখনই জ্ঞান ফিরেছে; রাত ফুরিয়ে সকাল হলো যে! তবে এবার দে ঘুম! একসময় গদ্য-পদ্য সাহিত্য রচনার যুগ ছিল। গল্প-উপন্যাস পাঠের ধুম প্রতিযোগিতা হতো। পাঠাগার-লাইব্রেরিগুলো বই পুস্তকে ঠাসা ছিল। প্রাচীন ও আধুনিক শতশত গ্রন্থের মজুদ সমৃদ্ধ করেছিল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাইব্রেরিগুলো।

একটা সময় জ্ঞানচর্চা ও পড়াশোনাই ছিল ব্যস্ততা। গবেষণা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল 'পড়াশোনা'। যারাই কলম ধরতেন, গদ্য-পদ্য-গল্প-কাহিনিতে সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়াতেন। তাদের লেখায় পর্যাপ্ত খোরাক ছিল। ছিল জীবনযাপনের নির্দেশনা। সমাজ ও মানুষ গড়ার যথেষ্ট উপাদানে ভরপুর থাকতো লেখাগুলো। এখন লেখক থাকলেও লেখায় প্রাণ নেই। আলো নেই। নেই অধঃপতিত সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের যথেষ্ট প্রতিকার। এখন ঘরে ঘরে লেখক। জনে জনে প্রকাশক। যথেষ্ট গ্রাহক-পাঠকের অভাব এখন। এখন কেউ পড়ে না, হাতে গোনা ক'জন ছাড়া!

পড়াশোনাও যে এক প্রকার নেশা, তা আর এখন তেমন চোখে পড়ে না। কীভাবে পড়বে? পাঠ্যতালিকার বইপুস্তকই যখন চরম অবহেলিত তখন বাড়তি বই পাঠের ফযীলত বয়ান করে কি লাভ? খামোখা কালি ফুরোনো ছাড়া আর কিছু! ডিশ এন্টেনার বিরূপ প্রভাব শুরু হয়েছে এই কিছুদিন হলো। যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমাজে এখন ইন্টারনেটের সয়লাব। টিভিটকশো, গানবাদ্য আরো যতসব এখন তো হাতের মুঠোয়। কি ছাত্র, কি শিক্ষক সবাই এখন ব্যস্ত।

বই একদম ধরা হয় না। পড়া হয় না। পাঠকের অভাব ইত্যাদি। প্রমাণ কি? ফেব্রুয়ারি এলে মাসজুড়ে মেলা বসে। বইমেলা। হ্যাঁ, ওটা মেলাতেই সীমাবদ্ধ। বরং কপোত-কপোতীদের মিলনমেলা বলাই ভালো! কারণ, ক্রেতাশূন্যতা ও প্রকাশকদের লোকসান গোণাই আমাদেরকে জানান দেয় যে, পাঠক সঙ্কটই এখন বড় সমস্যা! মানে পাঠকের অভাব। ক্রেতার অভাব।

তবে নেটের দর্শক-পাঠক সংখ্যা কিন্তু ঠিকই আছে। বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। হোক তা জ্ঞানচর্চার নামে। কিংবা ভিন্ন কোনো অজুহাতে। এখন প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার মানদণ্ডই যে পাল্টে গেছে!

মীযান মুহাম্মাদ হাসান

হায়রে ভীতুর ডিম

মাগরিবের পর ক্লাসটা অনেক বড়। নামাযের পর থেকে নয়টা পর্যন্ত। শুরুতে কিছুটা আগ্রহ নিয়ে পড়লেও শেষে ক্লান্তি চলে আসে। একদিন মাগরিবের পর পড়তে পড়তে ছুটির সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। ছাত্র ভাইয়েরা সবক নিয়ে ছুটোছুটি করছে। একজন অপরজনকে শুনাচ্ছে। আমি একজনকে ডাক দিলাম। কারণ শেষ সময়ে আর পড়তে ভালো লাগে না। সবক শুনে শেষ করলাম। ক্লাসও ছুটি হয়ে গেলো। ইশার নামাযের প্রস্তুতি চলছে। উস্তাদগণ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। এ সুযোগে এক ছাত্র ভাই কলরবের একটি গজলের সুরে অন্য একটি গজল গাওয়া শুরু করলো। তার সুর শুনে আর অঙ্গভঙ্গি দেখে পুরো রুমে হাসির বন্যা বয়ে গেলো। আমরা তার সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার আগেই উস্তাদজী চলে আসলেন। আর তাল মেলানো হলো না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইশার নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেলো। নামায পড়াচ্ছেন আমাদের ছাত্রভাইদের মধ্যে বড় একজন। নামাযে দাঁড়ানোর পর থেকে আকাশটা কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেলো। মেঘের গর্জনে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। এর মাঝেই নামায চলছে। হঠাৎ শেষ রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার সময় বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো। বজ্রপাতটি হয়েছে মাদরাসার আশপাশে কোথাও। তাই মনে হলো, যেন বজ্রের উত্তাপ কিছুটা আমাদের শরীরেও স্পর্শ করেছে। খুব ভয় পেলাম।

এরই মধ্যে ঘটে গেলো একটি ঘটনা। অনেকক্ষণ হয়ে গেলো; অথচ ইমাম সাহেব সিজদা থেকে উঠছেন না। আমি ভাবতে লাগলাম, না জানি ইমাম সাহেব সিজদার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন! শুনেছি আগের যুগে নাকি বড় বড় বুযুর্গ ব্যক্তিরা সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। আবার ভাবলাম, নাকি ইমাম সাহেব ভয়ে পালিয়েছেন। ভাবতে ভাবতে কেউ একজন তাকবীর দিলো। তখন সবাই উঠে বসলাম। তাকিয়ে দেখি, ইমাম সাহেব নিজ স্থানেই বসে আছেন। তাহলে আসলে ঘটলটা কি?

নামাযের পর ঘটনা বুঝতে পেরে খুব হাসি পেলো। ঘটনা হচ্ছে এই, যখন বিকট শব্দে বজ্রপাত হলো, তখন ইমাম সাহেব ভয়ে সিজদা থেকে উঠে বসে পড়েছেন; তাকবীর দিতেও ভুলে গেছেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আলী
হিফয বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

উস্তাদের অবাধ্যতার প্রতিফল

দুই বছর আগের কথা। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। শশমাহী পরীক্ষার পর মাদরাসা ছুটি হলো। ছুটির আগের দিন রাতে মুহতারাম উস্তাদজী সকল ছাত্রকে নিয়ে বসলেন এবং কিছু নসীহত করলেন। হুযূরের কথার মধ্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা হলো, একাকি বাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়িতে কোন অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলবে না এবং কেউ কিছু খেতে দিলেও খাবে না। এভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে তিনি বয়ান শেষ করলেন। কিন্তু দুরন্ত বয়স কি আর অত কিছু শোনে।

সকাল বেলা। ফজরের নামায পড়ে সকল ছাত্র হুযূরের কথামতো চলে গেলো। কিন্তু তিনজন ছাত্র হুযূরের কথা অমান্য করে নিজের মতো করে একাকি বাড়ি যেতে লাগলো। তাদের সকলেরই বাড়ি কুষ্টিয়া। তারা যশোর থেকে ট্রেনে উঠলো। ট্রেন চলছে। এরই মধ্যে এক ভদ্রলোক তাদের সামনের সিটে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পর তাদের সাথে ভদ্রলোকটি কথা বলা শুরু করলো, বাবা! তোমাদের বাসা কোথায়? তোমরা কোন্ মাদরাসায় পড়ো? এভাবে একপর্যায়ে লোকটা তাদের বাড়ির নাম্বারও চেয়ে বসলো। তারা উস্তাদজীর কথা অমান্য করে ঐ অপরিচিত লোকটাকে তাদের বাড়ির মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিলো।

এর পরের খবর খুবই বেদনাদায়ক। ছেলেগুলোর পিতা-মাতা খুবই গরীব, কিন্তু তাকদীরে যা আছে তাই তো হবে। ঐ লোকটা তাদের বাড়িতে ফোন করে বললো, আপনাদের তিন ছেলে এখন আমাদের হাতে বন্দি; যদি ছেলেকে জীবিত ও সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেতে চান, তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যে দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিন এই নাম্বারে। এবার পিতা-মাতার পেরেশানী কে দেখে! তারা একবার মাদরাসায় ফোন দেয়, একবার অন্যান্য ছাত্রদের বাসায় ফোন দেয়, কিন্তু কোন কাজ হলো না। কোন উপায় না পেয়ে শেষমেশ কারো নিকট থেকে ঋণ করে দ্রুত দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলো।

উস্তাদের কথা না মানার কারণে আজ এতো বড় বিপদে তাদের পড়তে হলো। এজন্য জীবনে চলার পথে সর্বক্ষেত্রে গুরুজন ও উস্তাদগণের কথা মান্য করে চলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে অনেক বড় বড় বিপদে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ শামীম রেজা
আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, যশোর।